[প্রাচীন যুগ]

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

শ্রীকমলেশচন্দ্র লাহিড়ী

চলন্তিকা প্রকাশক : ৪ কলেজ রো, কলি-৯

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক নব-প্রবর্তিত ইতিহাসের সিলেবাস অনুসারে
ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত।
[*Vide Notification No. T. B. VI/H/79/57 dated 5. 12. 79*]

ইতিহাস পরিচয়

(প্রাচীন যুগ)

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীকমলেশচন্দ্র লাহিড়ী, এম. এ.
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান
ইতিহাস পরিচয় (৭ম-৮ম শ্রেণীর) গ্রন্থের গ্রন্থকার
প্রণীত

নবতম সংস্করণ

চলন্তিকা প্রকাশক
৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ নির্ধারিত ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 'ইতিহাস পরিচয় (প্রাচীন যুগ)' লেখা হ'ল। পর্ষদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী ও সেই সংক্রান্ত নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের পরিবর্তিত পদ্ধতির কথা মনে রেখে "পরিশিষ্ট" অংশে প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত বইটি তাদের প্রত্যাশিত আশা মেটাতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বইটি সম্পর্কে সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহযোগিতা কামনা করি ও তাঁদের উপদেশ প্রার্থনা করি। এই বই লেখার পেছনে শ্রীমতী সুনন্দা লাহিড়ী ও ডঃ রামদুলাল বসুর পরামর্শ ও সাহায্য আমাকে উৎসাহিত করেছে।

চলন্তিকা প্রকাশক-এর কর্ণধার শ্রীতপনকুমার চৌধুরীর অকৃপণ সহায়তা ছাড়া এই বই প্রকাশিত হ'ত না। তাঁকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

টি. ডি. বি. কলেজ
রাণীগঞ্জ

শ্রীকমলেশচন্দ্র লাহিড়ী

SYLLABUS

History of Ancient Civilisations :

A. (i) Why we should read history? (ii) How we came to know of ancient people?

B. Early man :
Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man') : food gathering men.

Old Stone Age :
Nature of tools and implements, their uses.
New Stone Age : (By 8000 B. C.)

Evolution of tools and implements. Man—a food ptoducer. The Neo-lithic revolution : Consisted of domestication of animals ; invention of pottery (wheel) ; weaving (clothing) ; dwellings—Stone house with defences ; early transport ; beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-painting etc.) ; use of formal language as a means of communications ; worship of goddess of productivity.

C. Copper Bronze Age :
Emergence of towns ; changes in production—Specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reason of the growth of River-valley civilisations.

D. The Early Civilisations (3000 B. C.—1500 B. C.) Mesopotemia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :—

(i) Mesopotamia : (a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas. (b) Fertility ot the soil,—crops. (c) Defence against floods. (d) Other occupations. (e) Achievements of the sumerians—imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone.cutting, metalurgy, transport and trade, script.

(ii) Egypt : (a) Location and nature of the land ; (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and Soldiers (Workers) ; (c) Trade ; (d) The Pyramids (Examples) ; (e) Religious beliefs ; (f) Chief occupations.

(iii) The Indus Valley : (a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) China : (a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ; (b) China in early times ; (c) Myths (particularly of flood).

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. **The Iron Age—Societies :**

a) Discovery and use of iron, its impact ; (b) Main (features of social and economic life ; (c) Growth of kingship.

I. (i) **Babylon :** Farming and commerce ; Temples and culture ; the code of Hamurabi—nature of society revealed by the code. (ii) **Egypt as an Imperial Power :** Colonies ; The power of priests. (iii) **Iran :** Rise of Persia ; Zoroaster ; (iv) **The Jews :** Hebrews in Egypt ; Hebrew exodus under Moses—flight from slavery.

II. Greece (Only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete : the Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation Athens and Sparta—their social and political life—Athens Vs. Sparta, Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion —brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire ; Roman conquuest of Greece.

III. Rome :—Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Patricians and Plebians ; Roman Citizenship, slavery and slave revolts Spartacus). Julius Caesar ; End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. China :—"Great Shang" Confucius—his teachings. Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. India :—(a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion and political organisation. (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Mouryas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (On the basis of proven historical mentrals). (h) Foreign contacts (particularly with central Asia) —their impact upon society and trade ; (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa-hien—general picture of society as revealed in their account (in brief outlines). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature education (Toxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

The presentation all through should be made in brief outlines, and mostly in story-telling style.

* Volume of book—Approx. 96 Pages. No, of lessons required—Approx. 75.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ?
(Why we should read History ?)

ইতিহাস মানব-সমাজের অগ্রগতির বিবরণ। পূর্বের ঘটনা না জানলে বর্তমানকে জানা যায় না। অতীতের ঘটনার ফলেই বর্তমানের সৃষ্টি। সুতরাং অতীতকে ভালোভাবে না জানলে আমরা বর্তমানকে জানব বা বুঝব কি করে ? ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক জানতে পারি। ইতিহাস আজকাল আর রাজাদের ইতিহাস নয় ; ইতিহাস আজ মানুষের সভ্যতা ও তার অগ্রগতির বিবরণ। আজকের সভ্য মানুষ তো আর হঠাৎ এই রকম সভ্য হয়নি। মানুষ তার আবির্ভাবের পর বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আজকের মানুষে পরিণত হয়েছে। আদিম যুগ থেকে মানুষের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, ভাষা, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি যুগে যুগে কত কি যে পরিবর্তন হয়েছে তার পরিচয়ই ইতিহাস। আমাদের এই পৃথিবীর সব কিছুই চলছে মানুষকে ঘিরে। সেই মানুষ প্রথমে কি ছিল, কেমন করে বাস করত ও কেমন করে জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আজকের সভ্য মানুষে পরিণত হল— তা জানতে পারাই ইতিহাস-পাঠের উদ্দেশ্য। সামাজিক বিবর্তনে কত রকমের উপাদান যে কাজ করছে তা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায়। একই মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন সভ্যতার স্রষ্টা হয়েছে। ইতিহাস পড়লে আমরা তা জানতে পারব। আমরা সবাই মানুষ, সুতরাং মানুষ সম্পর্কে জানতে চাইব, সে যেখানকার মানুষই হোক না কেন, তাই তো স্বাভাবিক। মানুষ সম্পর্কে জানতে হলেই ইতিহাস পড়তে হবে। অতীতের ভুলত্রুটি দূর করে ও অতীতের গুণগুলি গ্রহণ করে বর্তমান সমাজ গড়ব—এই তো সবার আদর্শ হওয়া উচিত। এই আদর্শ সামনে রেখে চলতে গেলে ইতিহাস-পাঠ অবশ্য প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) আমরা মানুষের অতীত সম্বন্ধে জানতে পারি কি করে ?

(খ) মানবজাতির আদর্শ কি হওয়া উচিত ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | কিভাবে আমরা প্রাচীনকালের অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে পারি ?

(How we came to know of ancient people ?)

অতীতে যা হয়েছে তা আমরা কি করে জানব ? এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বহু কোটি বছর আগে, মানুষের জন্ম হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে। আদিম মানবকে আমরা কেউ দেখিনি। তবে কি করে আদিম মানবের কথা জানা যায় ? যে পণ্ডিতরা খনন কাজকে বিজ্ঞানের মত ব্যবহার করে উঁচু ঢিবি ও ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপর আলোকপাত করেছেন, তাঁদের পুরাতত্ত্ববিদ্ বলা হয়। আধুনিক পুরাতত্ত্বের ফলে কয়েক হাজার বছর আগের মানব-সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। খননের ফলে প্রাচীনকালের অসংখ্য জিনিস আজ আমাদের জ্ঞানের আওতায় চলে এসেছে। এইভাবে প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি দেখলে আমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে পারি। ঠিক অনুরূপভাবে প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমরা প্রাচীন ইতিহাস ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারি। প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি, মুদ্রা, প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থই প্রাচীন ইতিহাস রচনার মূল উপাদান।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ঃ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা খনন করে আবিষ্কার করেছেন বহু ধাতুনির্মিত ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। পাহাড়ের গুহায় পেয়েছেন চিত্র, কবরের মধ্যে পেয়েছেন মৃত

মানুষের কঙ্কাল, মাটির নীচে কোথাও পেয়েছেন জীবজন্তুর অস্থি, কোথাও বা জঙ্গল পরিষ্কার করে বা মাটি খুঁড়ে ঘর-বাড়ি, এমনকি বিরাট শহর আবিষ্কার করেছেন। সেই সব অঞ্চলে মন্দির, মূর্তি, মুদ্রা, মাটির বাসন আরও কত কি পেয়েছেন। মহেঞ্জোদরো নামে সিন্ধুদেশের এক জায়গায় অনেক ঘরবাড়ি, সীলমোহর, মাটির বাসন, নানারকম মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সেগুলি দেখে বোঝা যায় সেই সময়ে সিন্ধু অঞ্চলে সভ্য মানুষের বসতি ছিল। মেসোপোটেমিয়ার ব্যাবিলন (বর্তমান নাম ইরাক) অঞ্চলেও খননের ফলে প্রাচীনকালের অনেক কিছু পাওয়া গেছে। সেখানেও ঘরবাড়ি, সীলমোহর, অস্ত্রশস্ত্র, লিপি ইত্যাদি আবিষ্কার করা হয়েছে। এ সবই আমাদের প্রাচীনকালের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে।

প্রাচীন শিলালিপি ঃ প্রাচীন যুগের রাজারা তাঁদের যুদ্ধবিজয়, জন্মদিন বা অভিষেকের দিন, দানপত্র ইত্যাদি স্মরণীয় করার জন্য পাথরের ফলকে
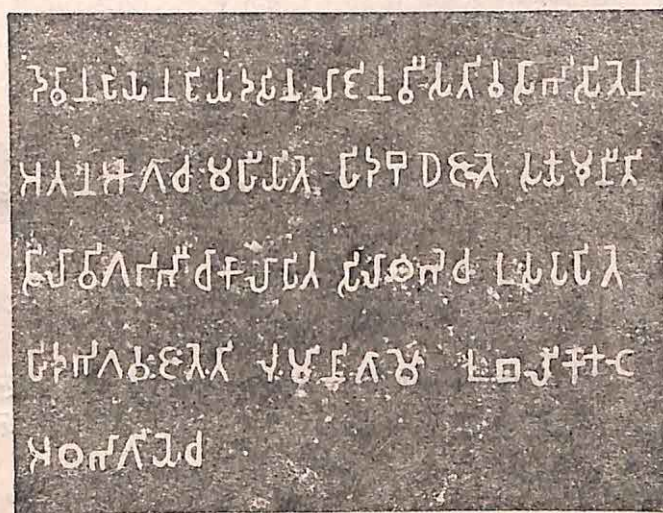
অশোকের শিলালিপি

শিলাস্তম্ভে, পাহাড়ের গায়ে অথবা ধাতুর পাত্রে নিজেদের কীর্তিকাহিনী লিখে রাখতেন। মিশরের রসেটা পাথরের ওপর মিশরের রাজার বিজয়-কাহিনী ও এ্যাসিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী লেখা আছে। ধর্মপ্রাণ রাজারা ধর্মের উপদেশ পর্বতের গায়ে লিখিয়ে রাখতেন। আমাদের দেশে

মহারাজা অশোক বৌদ্ধধর্মের অনেক উপদেশ শিলালিপিতে লিখিয়ে রেখেছেন। সেগুলি পড়ে বৌদ্ধধর্ম কেমন ছিল ও অশোক কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন তা জানা যায়। প্রাচীন শিলালিপি অতীত ইতিহাস জানতে খুব সাহায্য করে।

মুদ্রা : নানা জায়গা থেকে প্রাচীন যুগের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেইসব মুদ্রার ওপরে রাজাদের নাম, সময়, মূর্তি আরও অনেক কিছু লেখা আছে; কোন কোন মুদ্রার ওপরে দেবদেবীর মূর্তি আঁকা আছে। এইসব মুদ্রা দেখে প্রাচীন রাজার নাম, দেশের আর্থিক অবস্থা, মানুষের সৌন্দর্য-জ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাওয়া মুদ্রা থেকে শক, কুষাণ, ব্যাকট্রিয়ান ইত্যাদি বিদেশীদের ভারত-আগমন ও ভারতে শাসন-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন মুদ্রা

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য : বেদ, বাইবেল, জিন্দে আবেস্তা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকেও প্রাচীন সমাজের আদর্শ, জীবনযাত্রা, ধর্ম ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা যায়। ভারতের রামায়ণ, মহাভারত গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি, রোমান কবি ভার্জিলের ইনিড্ ও রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ, পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ প্রাচীন ইতিহাস-রচনার বিশিষ্ট উপাদান।

তবু প্রাচীন যুগের মানবজাতি সম্পর্কে আমাদের যতটা জানতে ইচ্ছে করে তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন যুগের ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ। তবে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন তথ্য আবিষ্কার করে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছেন।

প্রশ্নাবলী

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন :**

(ক) কোন্ কোন্ উপাদানের সাহায্যে আমরা প্রাচীনকালের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারি?

২। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :**

(ক) ইতিহাসের উপাদান কাকে বলে ও কি কি?

(খ) ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে প্রাচীন শিলালিপির বর্ণনা দাও।

(গ) ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(ঘ) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায় কিভাবে সাহায্য করে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ | আদি মানব (Early Man)

মানব সভ্যতার প্রথম অধ্যায় প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা জানতে পারি মানুষ তার পরিশ্রম ও বাইরের হাতিয়ারের সাহায্যে আজকের সভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে। মানুষের হাতিয়ার তৈরী শুরু হয়েছে প্রায় পাঁচশো হাজার বছর আগে। হাজার হাজার বছর আগে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় পর্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম আবহাওয়া ছিল। চারটি নির্দিষ্ট বরফ ও হিমবাহের যুগ এসেছিল। একটি বরফের যুগ ও আরেকটির মাঝে ছিল কিছুটা গরমকাল। আদিম যুগের মানুষ এই দুই রকম বরফ যুগের মাঝে উন্নতি লাভ করে। আধুনিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে হোমি নিড বা মনুষ্য জাতীয় প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছে আফ্রিকায়, প্রথম বরফের যুগে। এরা বোধ হয় ৫,০০,০০০ বছর আগে বাস করত। এরাই ইতিহাসের আদি পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ।

এশিয়ার আদিমানবের প্রথম চিহ্ন পাওয়া গেছে জাভায়। এরপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন চীনা পণ্ডিত ডবলিও. সি. পেই চীনের পিকিং শহরের কাছে চাও-কাও-টিয়েন নামক পর্বত গুহায় আদি মানবের মাথার খুলি আবিষ্কার করেন। এই খুলির কাছে আগুন ও পাথরের অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা এই মানুষের মাথার খুলি দেখে অনুমান করেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৫,০০,০০০ বছর আগে মানুষের বাস ছিল। ইউরোপে এই সময়ের মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে জার্মানীর হাইডেলবার্গ শহরের কাছে নিয়াণ্ডারথাল উপত্যকায়। এই যুগে মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত। আগুনের ব্যবহার মানুষের জীবনধারায় অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আগুনের সাহায্যে শক্ত মাংস ও শিকড় নরম করে খাওয়ায় তারা অন্য কাজে মন দিতে পারল। আদিমানুষ ক্রমে আগুনকে নানা কাজে ব্যবহার করতে শিখল—আগুনের সাহায্যে গুহা গরম রাখা, আগুনের মশাল দিয়ে

ভয় দেখিয়ে বড় বড় পশু শিকার করা ইত্যাদি। আগুনের ব্যবহার ছাড়া মানুষ পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতে শিখেছিল এই সময়ে।

এর পরের যুগেই "ক্রোমাগ্নন মানব-এর" আবির্ভাব ঘটে। ফ্রান্সে এই মানবের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। বর্তমান পৃথিবীর মানুষই ক্রোমাগ্নন মানবের উত্তর পুরুষ। সভ্যতার নানা স্তর পেরিয়ে ঐ শ্রেণীর মানবই বর্তমান সভ্যতায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

মানুষ—খাদ্য-সংগ্রাহক : আদিম যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক। তারা যাযাবরের মত দলে দলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। সাধারণত গাছের ফলমূল, নরম শিকড় ও পাতা, যা জঙ্গলে পাওয়া যেত, তাই খেত। তখনকার মানুষ শিকারও করত। ছোট ও বড় যে-কোনও জন্তু তারা শিকার করত ও তার মাংস খেত। মানুষ তখন শস্য উৎপাদন করতে জানত না। এক জায়গায় শিকার বা ফলমূল ফুরিয়ে গেলে তারা দল বেঁধে অন্য জায়গায় যেত, যেখানে ফলমূল বা শিকার পাওয়া যায়। সেই কালের মানুষ ছিল অসহায়, তাই খাবার সংগ্রহের জন্য তাদের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হত। আগুনের আবিষ্কার মানুষ তার জীবনধারণের কাজে লাগায়। কাঁচা মাংস খাওয়ার পরিবর্তে মানুষ মাংস ঝলসিয়ে নিয়ে খাওয়া অভ্যাস করল। এই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রান্নার আরম্ভ।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) আদিম মানবের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ?
(খ) আগুনের আবিষ্কার কি করে হ'লো ?
(গ) আদিম মানবের সমাজ-গঠন কিভাবে হয়েছিল ?
(ঘ) আদিম মানবের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পবিকাশের কাহিনী লেখ।
(ঙ) আদিম মানবের কর্মজীবনের সূচনা কি করে হয় ?
(চ) মানবজাতির বিভিন্ন শাখার বিবরণ দাও।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) আদিম যুগের মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহক ছিল কেন ? কিভাবে তারা খাদ্য সংগ্রহ করত ? আদিম যুগের মানুষ কি খেত ?
(খ) আদিম যুগের মানুষরা যাযাবর জীবনযাপন করত কেন ?
(গ) আদিম যুগে রান্নার আরম্ভ হয় কিভাবে ?
(ঘ) ইতিহাসে কারা আদি পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ ?

পুরাতন প্রস্তর যুগ
(Old Stone Age)

মানব-ইতিহাসের সব থেকে প্রাচীন যে সময়ের কথা আমরা জানতে পারি, সেই সময়কে ঐতিহাসিকরা বলেছেন পুরাতন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age বা Old Stone Age)।

আদিম মানুষ যখন থেকে প্রাকৃতিক পাথরের টুকরো থেকে রুক্ষ হাতিয়ার বা অস্ত্র তৈরির কৌশল আয়ত্ত করল তখন থেকেই সভ্যতার জন্ম হয়। নানা প্রাকৃতিক কারণে পাথর টুকরো হয়ে যেত। প্রাকৃতিক ভাবে পাথরের এই টুকরো হয়ে যাওয়া দেখে মানুষ ভাবল এই টুকরোগুলি হাতিয়ার হিসেবে নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। বরফের যুগের মানুষ ক্রমেই পাথরের টুকরো কি করে হাতে ধরা যায় তা শিখল। তারপর আয়ত্ত করল কোন্ কোণ থেকে পাথর ছুঁড়ে ঠিকমত আকারের পাথরের টুকরো ভাঙ্গা যায়। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ শুধু রুক্ষ পাথরের অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করেছে।
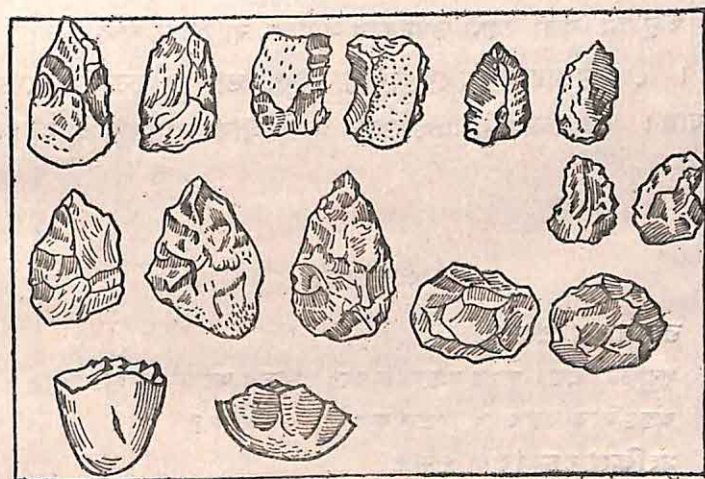
পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বা অস্ত্রগুলি তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) হাত কুড়োল, (২) দা বা কাটারি ও (৩) পাথরের টুকরোর অস্ত্র। হাত কুড়োল হাতের মুঠোয় ধরে কিছু কাটার জন্য বা জোরে ঘা দেবার জন্য

এই কাস্তে তৈরি হত। এই কাস্তে দিয়ে শস্য কাটা ও একত্রিত করা হত। তীর-ধনুক এই যুগে ব্যবহার করা হলেও তীরের মাথা আরও শাণিত করা হয়। সূঁচ ও হারপুন তৈরির জন্য হাড় ব্যবহার করা হত।

কৃষির আবিষ্কার—মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারী : নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিকের বিশিষ্ট অবদান হল কৃষির আবিষ্কার। খাদ্য আহরণের পথ ছেড়ে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করল। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে খাদ্য উৎপাদন এক বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। অনুমান করা হয়, মেয়েরাই প্রথম কৃষিকাজের পদ্ধতি শিখেছিল। পুরুষরা দলবদ্ধভাবে শিকারে বেরুলে মেয়েরা জঙ্গল থেকে নানা ফলমূল ইত্যাদি জোগাড় করত। তারা লক্ষ্য করল মাটিতে বীজ পড়লে গাছ জন্মায়। গাছ বড় হলে তার থেকে প্রচুর বীজ পাওয়া যায়। এইভাবে কৃষিকাজের সূত্রপাত হয়। নিয়মমত কৃষিকাজের দ্বারা নির্ভরযোগ্যভাবে খাদ্য উৎপাদনে মানুষ নিশ্চিন্ত হল। কারণ, মানুষকে পূর্বের মত খাদ্যের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হত না। জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেলে তারা অন্য জায়গায় গিয়ে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ-আবাদ করত।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগের পরবর্তী যুগকে কি যুগ বলা হয়? এই যুগের অস্ত্র-শস্ত্রের বিশেষত্ব কি ছিল?

(খ) মানুষের স্থায়ী বসতি প্রথম কোথায় গড়ে ওঠে?

(গ) মানুষ কি করে খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে খাদ্য-উৎপাদকে পরিণত হয়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব
(The Neolithic Revolution)

পশুপালন : পশুদের মানুষ কি করে.গৃহপালিত করতে শুরু করল তা বিশেষ জানা যায় না। অনুমান করা হয় মনুষ্য বসতির কাছে প্রচুর জন্তু-জানোয়ারও থাকত। এইখানে মানুষ জন্তু-জানোয়ারকে কাছে থেকে লক্ষ্য করল ও তাদের অভ্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারল। এই ভাবেই তারা জন্তু-জানোয়ার পোষ মানাতে শিখল। কুকুর প্রথম জন্তু যা মানুষের সঙ্গী হয়। এশিয়ার যেসব অঞ্চলে গম ও বার্লি নিজের থেকে হত, সেই সব অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া, ও শূকর থাকত। কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে এইসব জন্তু গৃহে পালন করা সহজ হল ; কারণ শস্যের ভূষি ও বাড়তি শস্য জন্তুর খাদ্য হিসাবে দেওয়া যেত। যাই হোক, ক্রমে ছাগল, ভেড়া, শূকর ও গরু মানুষের খোঁয়াড়ে আশ্রয় পেল। মানুষ একই সঙ্গে মাটি ও পশুদের কাছ থেকে সহজেই খাদ্য পেতে পারল। পশুর বাচ্চার দুধ খাওয়া দেখে মানুষ মাংস ছাড়াও নতুন খাদ্য দুধ খেতে শিখল। আবার পশুর, বিশেষ করে ভেড়ার লোম আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করতে থাকল। পশুরা মানুষকে দিল খাদ্য হিসেবে মাংস ও দুধ আর আচ্ছাদনের জন্য দিল গায়ের লোম। সবশেষে পোষ মানান হয় ঘোড়াকে।

মৃৎশিল্প ও বস্ত্রশিল্প : খাদ্য রাখা ও রান্নার জন্য পাত্রের প্রয়োজন হয়। তরল পদার্থ ধরে ও তাপ সহ্য করতে পারে এমন পাত্রের প্রয়োজন হয়। নব্য প্রস্তর যুগের শুরুতে শস্য রাখা ও শুকনোর জন্য খড় ও গাছের পাতা দিয়ে তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করা হত। এইরকম ঝুড়িতে মাটি লেপে তাতে জল রাখা হত। হয়ত এমন হয়েছে, হঠাৎ হাত থেকে এইরকম ঝুড়ি আগুনে পড়ে যায় ও খড় পুড়ে মাটির স্তর শক্ত হয়ে যায়। দেখা গেল, এই পোড়ামাটির পাত্রে জল রাখা সহজ, পাত্র জলে গলে যায় না। এই পোড়ামাটির পাত্র আগুনের তাপও সহ্য করতে পারে। এইভাবে মানুষ মৃৎশিল্প তৈরি করতে শিখল। এই কাজ করতে গিয়ে মানুষ কুমোরের চাকা আবিষ্কার করল। কুমোরের চাকা আবিষ্কার একদিনে হয়নি— ছুতোরের কাজে দক্ষতাবৃদ্ধির ফলেই কুমোরের চাকা আবিষ্কার করা সম্ভব

হয়। কুমোরের চাকা আবিষ্কার ও তার ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ক্রমে ঐ চাকাকে গাড়ী-টানা, সুতো-তৈরি প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহার করা হতে লাগল।

পশ্চিম এশিয়ার নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শনের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের চিহ্ন পাওয়া গেছে। চামড়া ও গাছের পাতার বদলে তুলো ও পশমের বোনা কাপড় আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হত। ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ সিন্ধু-সভ্যতার আমলে তুলোর উৎপাদন হত। প্রায় একই সময়ে ইরানে পশমের ব্যবহার ছিল। কাপড় বোনার আগে তুলো থেকে সুতো তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। চরকা ও মাকু তৈরির পর মানুষ তাঁত আবিষ্কার করে। কাপড় বোনার জন্য চরকা, মাকু ও তাঁত আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধির বড় জয়।

বসতিস্থাপন ও সমাজ-জীবনের শুরু ঃ মানুষ যখন কৃষিকাজ শুরু করল, তখন দেখল শুধু বীজ বপনই সব নয়, জন্মান গাছকে দেখাশোনা করা প্রয়োজন। খাবারের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। কৃষিকাজই মানুষের স্থায়ী বসতি স্থাপনে সাহায্য করল। নতুন আবিষ্কারের প্রতিভা বাসস্থান নির্মাণেও ব্যবহার করা হল। এই যুগের পরিবার সাধারণত মাটি, গাছপালা, বড় বড় কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরী কুটিরে বাস করত। এই যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষেরা যৌথভাবে ছোট ছোট গ্রাম বা জনপদে বাস করত। বন্য প্রাণী বা শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বেশির ভাগ গ্রাম জলাশয় বা বেড়া বা স্তূপ-করা জিনিস দিয়ে ঘেরা থাকত।

সমাজ-জীবনে মেলামেশা ও নানা জিনিসপত্রের প্রয়োজনে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথমে মানুষ মাথায় ও কাঁধে করে জিনিস-পত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। পাথর ইত্যাদি ভারী জিনিস নেওয়ার জন্য কপিকল ও চাকা-লাগানো গাড়ীর ব্যবহার করা হত। প্রথমে মানুষই চাকা-লাগানো গাড়ী টানত, কিন্তু ক্রমে গৃহপালিত ষাঁড়, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ার বা পশু দিয়ে এই কাজ করানো হতে থাকল। নব্য প্রস্তর যুগে গাছের আঁটি বেঁধে ভেলার মত নৌকো করা হত ও নদী পরিবহণে ব্যবহার করা হত, গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে নৌকোও বানানো হত।

স্থায়ী নিশ্চিন্ত জীবন ও কৃষিকাজের ফলে মানুষের হাতে এখন প্রচুর অবসর। অবসর সময়ে সে এখন পাথরের হাতিয়ার, নীড়ানি, মাটির পাত্র তৈরি করতে বা কাপড় বুনতে পারে। কিছু লোক খাদ্য উৎপাদন থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কাজে তাদের শক্তি নিয়োগ করতে শুরু করল। এরই ফলে সমাজে শ্রমবিভাগ এল এবং একশ্রেণীর কারিগর তৈরী হল।

স্থায়ী সমাজে প্রয়োজন হল কিছু নিয়মকানুনের। কি করে সামাজিক নিয়মকানুন চালু হয় সে বিষয়ে কমই জানা যায়। মনে হয়, সমাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত সবাই একত্রিত হয়ে নিত। সেই সময় রাজা বা সুগঠিত সরকার বলে কিছু ছিল না। মনে হয় সমাজে মোড়ল বা নেতা কেউ থাকতেন, যাকে সবাই মানত। চাষের জমির মালিকানা ছিল সমস্ত সমাজের। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বোধ হয় ছিল না। বাড়ি, মাটির পাত্র গয়নাপত্র অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হত।

ধর্মবিশ্বাস ও শিল্প ঃ নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ভয় ছিল—যেমন ঝড়, বজ্র, তুফান প্রভৃতিকে তারা ভয় করত। সূর্য ও চাঁদ আলো না দিলে অন্ধকার সৃষ্টি হবে—তার ভয় ছিল। সেইজন্য প্রাকৃতিক শক্তি, সূর্য, চাঁদ প্রভৃতির আরাধনা তারা করত। পশু ও গাছপালার প্রতিকৃতি বা "টোটেম" তাদের কাছে পূজনীয় ছিল—কারণ পশু ও গাছ-পালাকে তারা রক্ষক বলে মনে করত। তাই ভয় থেকেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন নব্য প্রস্তর যুগের বসতির মধ্যে ছোট ছোট মাটির মেয়েমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলিকে বলা হয় "মাতৃদেবতা"। যখন মানুষ কৃষিকাজ করতে আরম্ভ করল, পৃথিবী তাদের কাছে 'মা'-য় পরিণত হল। মাতৃমূর্তিকে তারা পূজো করতে আরম্ভ করল এই বিশ্বাসে যে, জমির উর্বরতা তাতে বৃদ্ধি পাবে।

নব্য প্রস্তর যুগের শিল্প ছিল পুরাতন প্রস্তর যুগের মত ভয় ও আশার প্রতিচ্ছবি। এই সময়ের যে ছবি পাওয়া গেছে তা মূলতঃ পর্বত গুহায় পাথরের ওপর আঁকা বা খোদাই করা। মনে হয় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এইসব ছবি আঁকা বা খোদাই করা হত। এছাড়াও এই যুগের মানুষ ব্যক্তিগত জিনিসে নানা কিছু আঁকত ও তার ব্যবহারের জিনিসে নানা চিত্র খোদাই করত।

প্রাচীন স্পেনের গুহাচিত্র

ভাষার জন্ম ঃ পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ ভাষা জানত না। মনের ভাব প্রকাশ করত পশুর মত চিংকার করে, অঙ্গভঙ্গি করে বা হাত নাড়িয়ে। যখন নব্য প্রস্তর যুগে যৌথ সমাজের উদ্ভব হল তখন এই রকম চিংকার বা সংকেত চলল না। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব অঙ্গভঙ্গি বা সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মনের ভাব, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হল উন্নত ভাষার। প্রথমে কতকগুলি বিশেষ শব্দের সৃষ্টি হয়। সেগুলি অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে উচ্চারণ করা হত। উচ্চারণের সময় ঠোঁট নড়ত ও জিবের কাজ হত। ক্রমে শব্দগুলি উচ্চারণের নিয়মিত অঙ্গ হল। প্রতিটি গোষ্ঠীর এইভাবে বিশেষ ভাষার সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ মানুষ শব্দগুলি বা মনের ভাবগুলি এঁকে দেখাতে আরম্ভ করল। সেই অঙ্কনগুলি ছিল বলার অথবা জানার সংকেত। সেই সংকেত-চিহ্নগুলিই আজকের অক্ষরের জননী।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ কি করে প্রথম জন্তুকে পোষ মানাতে শিখল? কোন্ জন্তু প্রথম মানুষের পোষ মানে? সবশেষে কোন্ জন্তুকে পোষ মানানো হয়?

(খ) নব্য প্রস্তর যুগে মৃৎশিল্পের উদ্ভব হয় কি করে? চাকার ব্যবহার কি করে মানুষকে সভ্য হয়ে উঠতে সাহায্য করে?

(গ) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষরা কি করে যন্ত্র তৈরি করতে শিখল?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) কিসের থেকে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে জানতে পারা যায়?

(খ) মানুষ প্রথম দুধ খাওয়া শিখল কি করে?

(গ) নব্য প্রস্তর যুগে অক্ষরের সৃষ্টি হয় কি করে?

(ঘ) মানুষ কি করে মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখল?

(ঙ) মানুষ কি করে ছুতারমিস্ত্রীর কাজ শিখল?

(চ) নব্য প্রস্তর যুগে ভাষার জন্ম হয় কি করে?

(ছ) মানব-সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হল কি করে?

(জ) সমাজে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হত?

(ঝ) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষরা কি দিয়ে তৈরী ঘরে বাস করত?

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ | তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ (Copper and Bronze Age)

নব্য প্রস্তর যুগে কৃষিকাজ শুরুর মাধ্যমে মানুষ বন্য থেকে বর্বর স্তরে উন্নত হয়। সেই যুগেই মানুষ শিখল নানারকম হাতিয়ার তৈরি করতে এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে। প্রায় ৪০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পূর্বের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ফলে সম্ভব হল নতুন নতুন আবিষ্কারের। এরই ফলে মানুষ অগ্রগতির এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছল—সভ্যতার উন্মেষ শুরু হল। সমাজের এই উন্নতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শহরের উত্থান। শহরের উত্থানের সাথে সাথে জীবনের সর্বস্তরে এমন এমন বিপুল পরিবর্তন হল যে, তাকে বলা হয় নাগরিক বিপ্লব।

শহরের উদ্ভব : নগর বা শহরের সৃষ্টি সভ্যতার বড় বিশেষত্ব। শহর বা নগর বলতে বোঝায় বহুলোকের একত্র বাস—ঘনবসতি। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগেই শহর-নগরের পত্তন হয়েছিল। মধ্য এশিয়াতেই প্রথম শহর, নগর গড়ে উঠেছিল। সু-আবহাওয়া, হ্রদের জল সবকিছু মানুষের বসবাসের পক্ষে উপযোগী ছিল—খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তাও ছিল। সেখানে মানুষ স্থায়ী বসবাস শুরু করলে শহর, নগর প্রভৃতি ক্রমে গড়ে ওঠে। ক্রমে শহরবাসীরা কৃষিকাজ করত না—তারা তৈরি করত সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। শহর ও নগরের বাসিন্দারা ছিল কারিগর, শ্রমিক, রাষ্ট্রের পরিচালক প্রভৃতি। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে নগর ও শহর সৃষ্টির কারণ ছিল ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি। জলসেচ বৃদ্ধি ও ধাতুর তৈরী উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষি-উৎপাদন বেড়ে যায়। খাল কাটা ও বাঁধ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক নিয়ে বড় সংগঠন। এইসব মানুষের বসতির ফলেই গড়ে উঠত শহর ও নগর।

ধাতুর আবিষ্কার ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন : ধাতুর আবিষ্কার মানুষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ধাতুর আবিষ্কার মানুষকে

সভ্যতার পর্যায়ে নিয়ে আসে। ধাতু মানুষকে দেয় পাথরের চেয়ে শক্ত ও স্থায়ী হাতিয়ার যা তারা ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। প্রথম যে ধাতু আবিষ্কৃত হয় ও হাতিয়ার তৈরির কাজে লাগে, তা হল তামা। অনেকদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কিছু অংশে পাথরের তৈরি হাতিয়ারের সঙ্গে তামার তৈরী হাতিয়ারের প্রচলন ছিল। সবচেয়ে প্রথমে তামার ব্যবহার দেখা যায় দক্ষিণ ইরাকের সুমের অঞ্চলে প্রায় ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। কালক্রমে তামার সঙ্গে টিন ও দস্তা মিশিয়ে এক মিশ্রিত ধাতু তৈরি হল—ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত হওয়ায় মানুষের আরও কাজে লাগল। এরই ফলে শুরু হল ব্রোঞ্জ যুগের। ধাতুর ব্যবহার সমাজে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল।

ধাতু গলানো ও তা থেকে নানারকম জিনিস তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রথম ঐতিহাসিক সমাজে ধাতুর কাজের জন্য আবির্ভাব হল দক্ষ কারিগরের। প্রথম থেকে ধাতুবিদ্যা এক শিল্পে পরিণত হল। খনি থেকে ধাতু তোলা, তাকে গলানো, ঢালাই করার জন্য সারাক্ষণের শ্রমের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফলে কৃষিকাজ বা পশুপালনের সঙ্গে এই সব কাজ সম্ভব হত না। ধাতুবিদ্যা সর্বসময়ের কাজে পরিণত হল। এই কাজই শিল্পে পরিণত হল, যার উৎপাদন অপরের প্রয়োজনে ব্যবহার হত। যারা এই কাজ করত, তারা জীবনধারণের জন্য অপরের বাড়তি খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভর করত। এইভাবে সমাজে বিশিষ্ট ও দক্ষ কারিগরশ্রেণীর আবির্ভাব হল।

ব্যবসা ও বাণিজ্য : নগরের অধিবাসীরা খাদ্যশস্য উৎপাদন করত না—কৃষিকাজ যারা করত, তাদের কাছ থেকে ধান, গম, যব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত। যারা কৃষিকাজ করত, তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করতে হত;—যার বিনিময়ে সে কারিগরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন—জমি-নিড়ানো ও শস্য-কাটার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনতে পারত। এইভাবে প্রাচীনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে জিনিস দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ক্রমে মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন শুরু হয়। অনেক

জায়গা ছিল যেখানে কৃষিকাজ হত কিন্তু খনিজ ধাতু পাওয়া যেত না; যেমন—মিশর, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শক্ত পাথর পাওয়া যেত না; —এইসব অঞ্চলে ধাতু আমদানি করতে হত। যেসব জায়গায় তামা, টিন ইত্যাদি পাওয়া যেত, সেই অঞ্চলের মানুষ ধাতু রপ্তানি করে খাদ্যশস্য আমদানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত।

সমাজজীবনে পরিবর্তন—নানা শ্রেণীর উদ্ভব : আদিম সমাজে প্রতিটি মানুষ একই রকম কাজকর্ম করত ও একই ভাবে বসবাস করত। সমাজ ছিল শ্রেণীহীন। সবাই মিলে খাদ্য সংগ্রহ করত ও তা একসঙ্গে ভোগ করত। কৃতিত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সামাজিক সাম্য ভেঙ্গে পড়ল ও সমাজে নানা শ্রেণীর সৃষ্টি হল। সব জমির উৎপাদন-ক্ষমতা সমান নয়। একটি পরিবার পরিশ্রম করে যত শস্য উৎপাদন করতে পারে, অন্য একটি পরিবার ততটা ফসল উৎপাদন করতে না-ও পারে। এই ভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ধাতু আবিষ্কারের ফলে এই বিভেদ আরও বেড়ে গেল—কারণ সবার পক্ষে ধাতুর তৈরী ভাল হাতিয়ার ও যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হত না। সমাজে জমির যৌথ অধিকার ভেঙ্গে গেল—রাজা, পুরোহিত প্রভৃতিরা ভাল জমি ও বেশির ভাগ জমির বংশানুক্রমিক ভাবে মালিক হলেন। ফসল নষ্ট হলে যেসব মানুষ ঋণ নিত, তাদের মহাজনের জমিতে কাজে লাগান হত। ঋণ শোধ না দিলে তাদের জমি রাজা বা পুরোহিতের দখলে আসত। এই ভাবে দাসশ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিছু লোক খাদ্য উৎপাদন থেকে মুক্ত হয়ে কারিগর, ব্যবসায়ী, সৈনিক ও কর্মচারীর পেশা গ্রহণ করল।

গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব : কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জমির ওপর চাপ বেড়ে যায়। অনেক স্থানে কৃষির জন্য কৃষকরা খাদ্য-আহরণকারী বন্যদের বিতাড়িত করে কৃষির জমি দখল করতে আরম্ভ করে। এইসব বন্যরা কৃষিকাজ আরও করতে আয়ত্ত করলে জমি নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে যারা পরাজিত হত, তাদের মধ্যে আহত ও বন্দীদের মেরে ফেলা হত বা বিজয়ীপক্ষ নিজেদের দলে নিয়ে নিত। বাড়তি ফসল ও ধন-সম্পদ নগরে বা শহরে জড়ো করার সময় থেকে বাইরের আক্রমণের

ভয় আরও বেড়ে গেল। কারণ এইসব সম্পদের লোভে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর নগর আক্রমণ করতে থাকে। এইভাবে নগররক্ষী দলও সৃষ্টি হল।
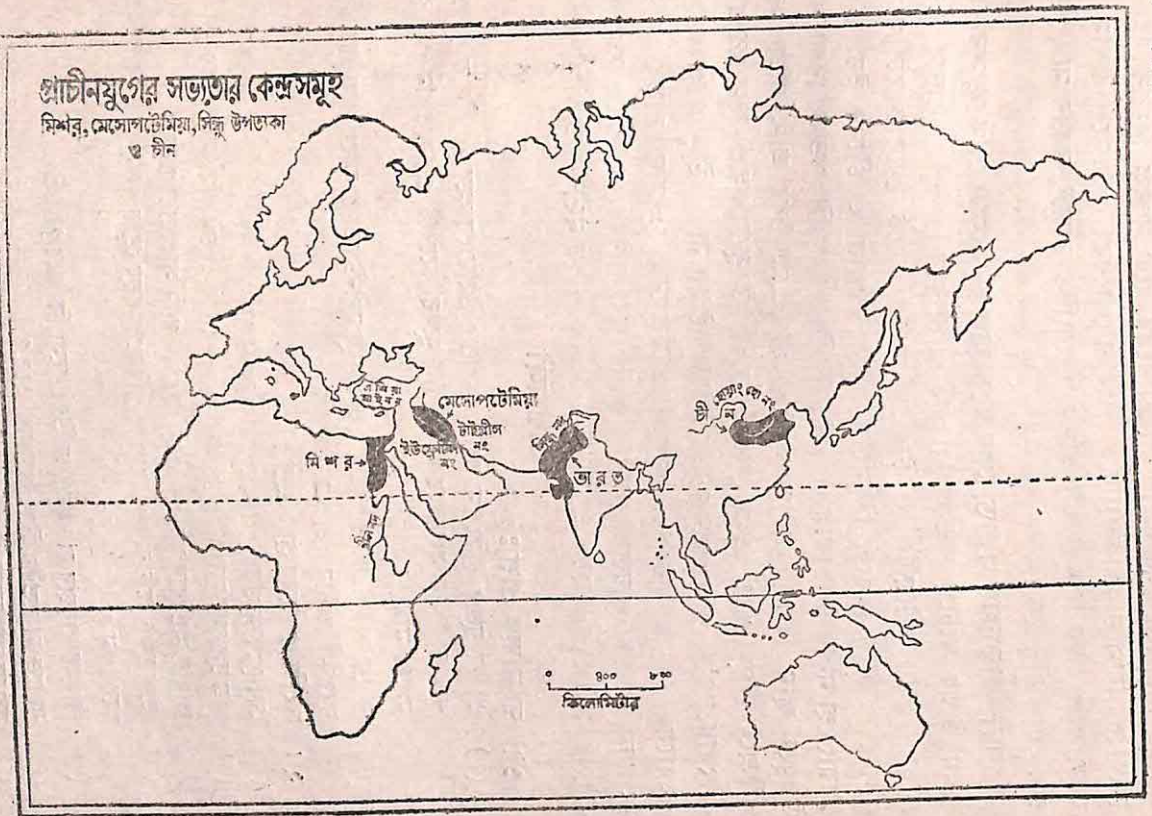
রাষ্ট্রের সৃষ্টি ঃ শহরের নানা বৃত্তি ও পেশার মানুষ আলাদা হওয়ায়—নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। বিভিন্ন লোকের মধ্যে লেনদেন

সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হল। তা ছাড়া দাস ও সাধারণ মানুষ দিয়ে কাজ করানো—নগর রক্ষা করা ইত্যাদি প্রয়োজনও ছিল—এইসবের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নগরের নিরাপত্তা রক্ষা করা—অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা—বিরোধের নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি। শহরের লোকেরা একজনকে প্রধান বা রাজা বলে মেনে নিত। ইনি হতেন "পুরোহিত রাজা", কারণ মনে করা হত, ধর্ম ও রাষ্ট্র এক।

নদী-উপত্যকায় সভ্যতা কেন গড়ে উঠল?—আমরা দেখি যে, সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে কতকগুলো নদী-উপত্যকায়। এই সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর কাছে মেসোপোটেমিয়ায়, নীলনদের কাছে মিশরে, সিন্ধুনদের তীরে হরপ্পায় ও চীনের ইয়ংসি ও হোয়াং হো নদীর উপত্যকায়। এই নদী-উপত্যকাগুলি সভ্যতা বিকাশের উপযুক্ত স্থান ছিল। এইসব অঞ্চলে ছিল প্রচুর উর্বর জমি, যাতে অল্প পরিশ্রমে বিপুল শস্য জন্মান যেত। কৃষির উপযুক্ত জলও ছিল প্রচুর। বারংবার বন্যায় পলি পড়ে জমির উর্বরতা নষ্ট হত না। উষ্ণ আবহাওয়াও চাষবাসের অনুকূল ছিল। কৃষকরা প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করতে পারত। সর্বোপরি নদীপথ পরিবহণের কাজে সহজেই ব্যবহার করা যেত। ফলে প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয় নদী-উপত্যকাগুলিতে।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন:

(ক) প্রাচীন যুগের ইতিহাসে শহর বা নগরের উত্থান হয় কবে? কি কি কারণে শহরের উত্থান সম্ভব হয়? প্রাচীন যুগের কয়েকটি প্রধান প্রধান শহর বা নগরের নাম কর।

(খ) কি কি কারণে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ নদী-উপত্যকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছে? কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার নাম কর।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন:

(ক) কোন্ কোন্ ধাতুর সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী হয়?

(খ) তাম্র যুগ কাকে বলা হয়? মানুষ প্রথম কোথা থেকে তামা সংগ্রহ করত? তামার আবিষ্কার মানুষকে সভ্য হতে কতখানি সাহায্য করেছে?

(গ) ব্রোঞ্জ যুগ কাকে বলে? তামার পরিবর্তে মানুষ ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে কেন?

(ঘ) বিনিময় ব্যবস্থার বা বাণিজ্যের উদ্ভব হলো কি করে?

(ঙ) সমাজে দাসশ্রেণীর উদ্ভব হলো কি করে?

(চ) সমাজে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো কি করে?

(ছ) রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন কারা?

(জ) নাগরিক বিপ্লব কাকে বলে?

চতুর্থ অধ্যায়

আদিযুগের সভ্যতাসমূহ (৩০০ খ্রীঃ পূঃ—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ)
(The Early Civilisation : 300 B.C.—1500 B. C.)

প্রথম পরিচ্ছেদ | মেসোপোটেমিয়া (Mesopotemia)

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ঃ মেসোপোটেমিয়া কথার অর্থ হল "দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল"। মেসোপোটেমিয়া ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর জলে বিধৌত। এর সর্বদক্ষিণ অঞ্চলকে প্রাচীনকালে বলত সুমের এবং এই

অঞ্চলই ছিল প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার মূল কেন্দ্রভূমি। সুমেরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে বলত ব্যাবিলন ও আক্কাদ। উত্তরের উচ্চভূমি অ্যাসিরিয়া বলে পরিচিত ছিল। মেসোপোটেমিয়া ছিল মূলত সমতলভূমি, শুধু দক্ষিণ

দিক ছিল কিছুটা ঢালু। উত্তরের পর্বতময় অঞ্চল থেকে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী জল বহন করে নিয়ে আসত ও তারই ফলে সমতলভূমি উর্বর হত।

পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার উন্মেষ মেসোপোটেমিয়াতেই হয়। মিশরীয় সিন্ধু-সভ্যতার অনেক আগে মেসোপোটেমিয়ায় সভ্যতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। অনেক দিক থেকে মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার পথপ্রদর্শক; অন্যান্য সভ্যতা তারপরে এসেছে। মেসোপোটেমিয়ার নিপ্পুর অঞ্চলের নিদর্শন থেকে মনে হয় ৫২৬২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সেই অঞ্চল সভ্য ছিল। কিস্ অঞ্চলে ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে শহর রাজারা রাজত্ব করতেন। উর শহরে ৩৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রাজাদের রাজত্ব ছিল। প্রায় ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সুমেরীয় সভ্যতা উন্মেষের চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এই সময়ের বিশিষ্ট শহরের মধ্যে ইরেক, ইরুডু, লাগস্ ও উর বিখ্যাত। প্রতিটি শহর ছিল এক-একটি ছোট রাজ্যের রাজধানী ও তাদের সভ্যতার ধরনও ছিল একই রকম। পরস্পরের মধ্যে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ হত। প্রায় ২৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে উর অঞ্চলের রাজারা শক্তিশালী হয়ে অন্যান্য অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন।

জমি, বন্যা ও শস্য : মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার ভিত্তি ছিল জমি। শীতকালীন বৃষ্টির বন্যায় জমি খুব উর্বর হত। নদীর জল পাড় অতিক্রম করে বন্যার সৃষ্টি করত। নদীগর্ভ ছিল উঁচু—সেইজন্য সুমেরীয়ানরা খাল কেটে ও বাঁধ তৈরি করে বন্যাকে রোধ করতে চেষ্টা করত। খাল কেটে জমিতে জল নিয়ে যেত। অসংখ্য খাল থাকায় বাড়তি জল খাল দিয়ে জমিতে চলে আসায় বন্যার প্রকোপ কমে যেত। সব সময়ে জল পাওয়ার জন্য তারা খাল দিয়ে জল এনে বড় বড় জলাশয়ে জমিয়ে রাখত। খালের মাধ্যমে জল আনার ব্যবস্থা সুমেরীয় সভ্যতার বড় অবদান ও এই ব্যবস্থাই ছিল এই সভ্যতার ভিত্তি। কৃষিকাজই ছিল মেসোপোটেমিয়ার প্রধান জীবিকা। প্রায় ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ তারা পশুর দ্বারা টানা লাঙলে চাষ করত। দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ায় প্রচুর খেজুর হত। খেজুর থেকে ময়দা, মধু, পানীয় ছাড়াও ঐ গাছের আঁশ থেকে দড়ি ও ঝুড়ি তৈরী হত। সেই সময় মেসোপোটেমিয়ায় সাধারণত যব, খেজুর ও নানারকম সবজি হত।

অন্যান্য উপজীবিকা : মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীরা তখনও কিছুটা আদিম ছিল। তারা তামা ও টিনের ব্যবহার জানত ও সময়ে সময়ে তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করত। কিন্তু তখন ধাতু বিলাসের পর্যায়ে ছিল, কারণ পাওয়া যেত কম। মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীরা সাধারণত ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরত। ক্রমে সুতো ও কাপড় তৈরির কৌশল আয়ত্ত হলে কাপড় তৈরি হতে থাকে। কাপড় তৈরির জন্য সুতো কাটার লোক, কাপড় বোনার লোক ও কাপড় রং করার লোক পেশাগত বৃত্তি গ্রহণ করে। এইভাবে ধাতু ও বস্ত্রশিল্পে পেশাগত লোকের আবির্ভাব হয়। মেসোপোটেমিয়ায় তখনও পোড়ামাটির ও পাথরের টুকরোর হাতিয়ারের খুব প্রচলন ছিল। ঐ অঞ্চলের লোকেরা গহনাও ব্যবহার করত। ফলে, পাথরের হাতিয়ার, সোনা-রূপোর গহনা, তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও গহনা তৈরির জন্য প্রচুর লোক পেশাগত দক্ষ কারিগরে পরিণত হয়। পুরোহিত, ব্যবসায়ী, পণ্ডিত, চিকিৎসক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকও পেশাগত ছিলেন। এঁরাই বিত্তবান ও গরীবদের মধ্যে মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত।

সুমেরীয়দের অবদান : মেসোপোটেমিয়ার সর্ববৃহৎ শহর উর শহরের খননের ফলে সুমেরীয় শহর রাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। প্রতিটি শহর তিনভাগে বিভক্ত ছিল—পবিত্র এলাকা, উঁচু দেওয়াল ঘেরা শহর ও বাইরের শহর। শহরের প্রধান মন্দিরকে বলত "জিগুরাট" (Ziggurat) অর্থাৎ "স্বর্গের পাহাড়"। একটি কৃত্রিম পাহাড়ের ওপর ইঁট দিয়ে এই মন্দির তৈরী হয়েছিল। পবিত্র এলাকা ছিল রাজ্যের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র, ভাণ্ডার ও সরকারী কাজের অফিস। জিগুরাট অনেক দূর থেকে দেখা যেত ও নাগরিকরা স্বর্গীয় দেবতার উপস্থিতি অনুভব করত। প্রধান মন্দিরের কাছে আরও ছোট ছোট মন্দির ছিল,—যেখানে পুরোহিতরা পূজো-পার্বণাদি করত। দেওয়াল-ঘেরা শহর ও বাহির শহর ছিল নাগরিকদের বাসস্থান। মন্দিরগুলি প্রায়ই জীবজন্তু, কোন বীর অথবা দেবতার মূর্তি দ্বারা সাজান হত। মূর্তি তৈরি করে ও দেওয়ালে মূর্তি এঁকে মন্দিরকে সাজান হত। সুমেরীয়দের অঙ্কন ও স্থাপত্য শিল্পে লাবণ্য ছিল না। রাজা ইয়ান-ডামের চিত্রাবলী (লাগস) ও উর-নীনার চিত্রাবলী সুমেরীয়

শিল্পকলার স্থূলত্ব প্রমাণ করে। এইসব চিত্রে ভোগময় প্রাণ-প্রাচুর্যের চিহ্ন আছে।

উরের রাজকীয় সমাধি খুঁড়ে অনেক রকমের ধাতু ও পাথরের তৈরী জিনিস পাওয়া গেছে। তার মধ্যে মূর্তি, নানারকম পাত্র, সোনা-রূপোর গহনাপত্র, রূপোর মাথার কাঁটা, সোনার মুকুট, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, হাতের বালা, গলার মালা ইত্যাদি আছে। এইসব প্রমাণ করে যে, প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ায় এক উন্নত ধাতু ও পাথর শিল্প ছিল। যারা এইসব তৈরি করেছে, তারাও শিল্প-দক্ষতায় ও ধাতুর জ্ঞানে দক্ষ ছিল। মনে হয়, ধাতুশিল্পে নিয়োজিত কারিগররা নিজেদের এমনভাবে সংগঠিত করতেন যে, তাঁদের বিদ্যা ও জ্ঞান মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে শিখিয়ে যেতেন। কালক্রমে ধাতুশিল্পীরা বংশানুক্রমিক হয়ে যান। মৃৎশিল্পীর চাকাও বোধ হয় প্রথমে মেসোপোটেমিয়ায় ব্যবহৃত হয়। তার আগে মাটির জিনিস তৈরী হত হাত দিয়ে।

মেসোপোটেমিয়ার সমৃদ্ধি সাধারণত নির্ভর করত তার বাণিজ্যের ওপর। কাঁচামালের জন্য তাদের বাইরের ওপর নির্ভর করতে হত। এই কাঁচামাল থেকে জিনিস তৈরি করে দেশে ও বিদেশে বিক্রি করত। বাইরে থেকে তারা আমদানি করত ভাল ভাল পাথর, কাঠ, সোনা ও নানারকম ধাতু এবং তার বিনিময়ে তারা দিত খাদ্যশস্য। যেহেতু তাদের অর্থনীতি অনেকটা বাইরের সঙ্গে ব্যবসার ওপর নির্ভর করত, সেইজন্য সব জিনিস যাতে ভালোভাবে তৈরি হয় সরকার ও শাসকরা সেদিকে দৃষ্টি দিত। তাদের নির্দেশ ছিল কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ব্যবহারও যেন ভাল হয়। ব্যবসার উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য সুমেরীয়রা পরিবহণ ব্যবস্থার ওপরও বিশেষ নজর দিত। স্থলপথে পরিবহণের জন্য সুমেরীয়রা চাকার গাড়ী ব্যবহার করত। নদী ও সেচের খাল পরিবহণের ক্ষেত্রে জলপথ হিসেবে ব্যবহার করা হত। নদী ও খাল পথে সহজেই জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা যেত। কেলেক কাঠের গুঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে ও তার সঙ্গে চামড়া ফুলিয়ে এক রকমের ভেলা তৈরি করে জলপথে জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা হত।

মেসোপোটেমিয়ার প্রথম লেখা অক্ষর সুমের অঞ্চলে সৃষ্টি হয়।

এগুলো ছিল ছবির অক্ষর বা কতকগুলো চিহ্ন যার সাহায্যে কোনও জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া যেত। যখন ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন হল তখন এই ছবির অক্ষর খুব কাজে আসত না। সুমেরীয়রা মনের ভাব বোঝাবার জন্য আবিষ্কার করল কতকগুলো নির্দিষ্ট ছবি বা চিহ্ন। এই চিহ্নগুলোই মনের ভাব বোঝান, নাম ও কথার জন্য ব্যবহার করা হত। পরবর্তী স্তরে উচ্চারণের সাহায্যে তাদের লেখার উন্নতি করল। সুমেরীয়দের আবিষ্কৃত অক্ষরগুলিকে বলা হয় কণিফর্ম অক্ষর। এই অক্ষর লেখা হত কোনও গাছের ডাল নীচের দিকটা সরু করে কেটে মাটির পাত্রের ওপর। এই মাটির পাত্র-গুলো পুড়িয়ে শক্ত করা হত। প্রতিটি পাত্র এক-একটি কাগজের পৃষ্ঠার মত। এ রকম অনেক মাটির ওপর লেখা পাত্র পাওয়া গেছে। তবে এগুলো বেশির ভাগই ব্যবসার দলিল, চিঠিপত্র ও বিক্রির দলিল। রাজকীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় উদ্ধৃতিও কিছু পাওয়া গেছে, তবে তাদের সংখ্যা খুব অল্প।

কণিফর্ম অক্ষর

প্রশ্নাবলী

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) 'মেসোপোটেমিয়া' কথার অর্থ কি? এই অঞ্চলটি কোথায় অবস্থিত? আনুমানিক কত খ্রীঃ পূঃ এই অঞ্চলে সভ্যতার উন্মেষ হয়? এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(খ) মেসোপোটেমিয়ার কোন্ অঞ্চলকে সুমের অঞ্চল বলা হত? এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মেসোপোটেমিয়ার নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। নগরগুলি কিভাবে শাসন করা হত? কয়েকটি বিশিষ্ট নগরের নাম কর।

(খ) মেসোপোটেমিয়ার লোকেদের প্রধান জীবিকা কি ছিল? তারা কিভাবে জমিতে জলসেচ করত?

(গ) মেসোপোটেমিয়ায় লিখিত অক্ষরের উদ্ভব হয় কিভাবে?

(ঘ) মেসোপোটেমিয়ায় জ্ঞানের উন্মেষ হয় কিভাবে?

(ঙ) মেসোপোটেমিয়ায় লোকেদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(চ) মেসোপোটেমিয়ানদের অর্থনীতি কিসের উপর নির্ভর করত? তারা কোন্ কোন্ জিনিস আমদানি ও কোন্ কোন্ জিনিস রপ্তানি করত?

(ছ) সুমেরীয়রা ভেলা তৈরি করত কি করে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | মিশর (Egypt)

অবস্থান ও প্রাচীন কাল ঃ মিশর দেশটি আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত। নীলনদের সংকীর্ণ সমতলক্ষেত্রই মিশর। মিশরের পূর্বে ও পশ্চিমে সুবিস্তৃত পর্বতমালা। পশ্চিমের পর্বতমালা পেরিয়ে গেলেই সাহারা মরুভূমি। মিশরে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। নীলনদই একমাত্র ভরসা। বছরে একবার নীলনদ প্লাবন হয়। প্লাবনের সময় চারদিক জলে ভরে যায় এবং গ্রামগুলি মনে হয় দ্বীপ। বন্যার জলে মাটি নরম হয়, পলি পড়ে ও জমি খুবই উর্বর হয়। এই প্লাবন না হলে মিশর শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হত। তাই মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

প্রায় ৪০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মিশরে নীলনদের অববাহিকায় অবস্থিত অধিবাসীরা সরকার তৈরি করে নিজেদের শাসন করত। নদের উভয় তীরে অধিবাসীরা বিভিন্ন "নোমেস" নামক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি "নোমেসে" একই জাতের লোক বাস করত, একই টোটেম ও দলপতিকে মানত ও একই দেবদেবীর উপাসনা করত। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মিশরের

বিভিন্ন অংশ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

নানান সুবিধা-অসুবিধার কারণে নোমেসগুলি দুটি রাজত্বে বিভক্ত হয়ে যায়—একটি উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণে। পরবর্তী কালে মেনেস নামে একজন

নীলনদের উপত্যকা

রাজা এই দুই রাজত্বকে এক করে প্রথম ঐতিহাসিক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেম্ফিসে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন।

ফ্যারাও, পুরোহিত, লিপি ও লেখক, কর আদায়কারী ও শ্রমিক : মিশরের রাজাকে ফ্যারাও বলা হত। পুরানো দেওয়ালে চিত্রে দেখা যায়

"বিরাট গৃহ" যেখান থেকে ফ্যারাও শাসন করতেন। এই গৃহকে মিশরীয়রা বলত "পেরো" ; ইহুদিরা এই শব্দকে পরিবর্তন করে বলত ফ্যারাও। পরবর্তী কালে সম্রাটের উপাধিও হয়ে যায় ফ্যারাও। এই গৃহ থেকেই তিনি পরিশ্রমসাধ্য ও কঠিন শাসনের কাজ চালাতেন। রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন তিনি ও তাঁর কথাই ছিল আইন। ফ্যারাও ছিলেন সর্বশে[illegible] বিচারক, —যে কোনও বিষয় তাঁর সামনে বিচারের জন্য আনা হত। য[illegible] তিনি রাজ্যে ভ্রমণে বেরোতেন, সামন্ত, অভিজাতরা সমস্ত এলাকার সীমান[illegible] এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন ও তাঁর আনন্দের ব্যবস্থা করতেন। এ[illegible] পরিবর্তে ফ্যারাও সামন্তর একটি ছেলেকে, তার সঙ্গে থাকার জন্য রাজসভা[illegible] নিয়ে যেতেন। এর ফলে সামন্তও অনুগত থাকত। রাজসভার বয়স্কদের নিয়ে তৈরী "বয়স্কদের সভা" বা 'সারু' (Saru) ফ্যারাওকে শাসন বিষয়ে পরামর্শ দিত। একদিক থেকে এই পরামর্শের কোনও মূল্য ছিল না, কারণ ফ্যারাও ঘোষণা করতেন তিনি দেবতা। দেবতার শক্তি ও বুদ্ধি তাঁর আছে[illegible] এই দেবত্বই ছিল ফ্যারাওদের ক্ষমতা ও সম্মানের মূল ভিত্তি। দেবতার ম[illegible] পুরুষ ফ্যারাও-এর অনেক সাহায্যকারী থাকত; —সেনাপতি, মন্ত্রী, পোশাক ইত্যাদি দেখার জন্য কর্মচারী ও আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ফ্যারা[illegible] ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। দেবতার উদ্দেশ্যে যে-কোনও শোভাযা[illegible] বা অনুষ্ঠানে তিনি নেতৃত্ব করতেন।

পুরোহিতশ্রেণী : মিশরে পুরোহিতশ্রেণী ছিলেন রাজার প্রধান শাসনস্তম্ভ। মিশরীয়রা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজো করত। ধর্মবিশ্বাসে জটিলতা থাকায় পুরোহিতশ্রেণী আচার-অনুষ্ঠান ও নানারকম অলৌকিক ক্রিয়ার সাহায্যে সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। দেবতা বা ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়ার পথে তাঁরা ছিলেন অপরিহার্য। ফলে পুরোহিত-পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়—পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পুরোহিত-পদ পেতেন। এইভাবে জনসাধারণের ভক্তি ও রাজার বদান্যতায় এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি হল, যারা কালক্রমে ধনে-মানে সামন্ত, এমন কি রাজ-পরিবার থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত জিনিসপত্র পুরোহিতের খাদ্য জোগাত—মন্দির ছিল তাদের বাসগৃহ। মন্দিরের জমি

থেকে আসত তাঁদের নিয়মিত আয়। বাধ্যতামূলক শ্রম, সামরিক কাজ ও সরকারী কর থেকে মুক্ত হয়ে পুরোহিতরা সমাজে বিশেষ ক্ষমতা ও সম্মানের পাত্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই পুরোহিতশ্রেণী শুধু ক্ষমতা ও সম্মান ভোগ করতেন না, তাঁরা মিশরের শিক্ষাদীক্ষা পরিচালনা করতেন। যুবকদের শিক্ষিত, শ্রম ও আদর্শে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেন।

লিপি ও লেখক ঃ মিশরীয়রা লেখার পদ্ধতি জানত। তাদের লিপিকে বলা হয় হিয়েরোগ্লিফিক্স বা পবিত্র লিপি, কারণ পুরোহিতশ্রেণী এই লিপি ব্যবহার করতেন। এই লিপিগুলি ছিল চিত্রাক্ষর। এই লিপির ২৪টি চিহ্ন ছিল। বহুদিন এই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। রসেটা নামক এক

হিয়েরোগ্লিফিক্স অক্ষর

জায়গায় একখণ্ড পাথর পাওয়া গেছে, যার গায়ে হিয়েরোগ্লিফিক্স, ডেমোটিক ও গ্রীক লিপি খোদাই করা ছিল। ফরাসী পণ্ডিত সাঁপলিয়ঁ রসেটা পাথরের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই চেষ্টার ফলেই প্রাচীন মিশরের প্রাচীন ভাষা ও ইতিহাস আজ আমরা অনেকটা জানতে পারি।

ফ্রান্সের লুভ্যর মিউজিয়ামে গেলে প্রতিটি দর্শকই প্রাচীন মিশরের লেখককে দেখতে পাবে। খালি গা, কুঁজো হয়ে বসে আছে, হাতে একটি কলম ও কানে গোঁজা একটি কলম। এই লেখকরা কাজের হিসেব, জিনিসপত্রের মূল্য, জিনিসপত্র জমা দেওয়ার হিসেব, লাভ-লোকসানের হিসেব রাখত। নানারকম চুক্তিপত্র ও উইলের খসড়া তৈরি করত ও আয়করের হিসেব রাখত লেখকেরা, তারাই লেখাপড়ার নানারকম কাজ করত। এই লেখকগোষ্ঠী ছিল যেমন পরিশ্রমী তেমনই একাগ্র।

কর-আদায়কারী ও শ্রমিক ঃ প্রাচীন মিশরে কর-আদায়কারীরা আদমশুমারির কাজ করত ও আয়করের হিসেব পরীক্ষা করত। নদীর জল মেপে তারা শস্য কেমন হবে জানাত ও সরকারের ভবিষ্যৎ-রাজস্বের হিসেব করত।

তারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের খরচ পূর্বেই হিসেব করে ভাগ করে দিত এবং শিল্প ও ব্যবসা দেখাশোনা করত।

মিশরের শ্রমিকরা ছিল বেশির ভাগই স্বাধীন ও অংশত দাস। কৃষকরা যা উৎপাদন করত, কর-আদায়কারীরা তার বেশির ভাগই কর হিসেবে নিয়ে নিত। যারা কর দিতে পারত না, তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত। শ্রমিকদের রাজার জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হত। খাল-খনন, রাস্তা-তৈরি, রাজার জমি চাষ করা, বড় বড় পাথর টানা (পিরামিডের জন্য) ইত্যাদি বাধ্যতামূলক কাজ করতে হত। অনেকেই ছিল দাস। যারা ঋণ শোধ করতে পারত না ও যুদ্ধের সময় বন্দী হয়েছিল, তারাই দাসে পরিণত হত। এদের ধাতুর কাজে খনিতেও পাঠানো হত। তাদের পরার কাপড় ও মুখে দেবার খাবার ছিল না। বৃদ্ধ, স্ত্রী ও ছোট ছেলেমেয়ের প্রতিও অনুকম্পা দেখানো হত না। ফলে শ্রমিক ও দাসেরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ প্রাচীন মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল আদিম যুগের মত। বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম্য বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। উচ্চশ্রেণীর বিলাসের জন্য প্রয়োজন হল বিলাসের নানা দ্রব্য যেমন, সুগন্ধি তেল, রূপো, প্রাসাদের জন্য কাঠ, নানারকম ধাতু ইত্যাদি। এর ফলে মিশরে বিদেশী বাণিজ্য আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। কিন্তু মিশরের শুল্ক-ব্যবস্থার কড়াকড়ির ফলে ও বাইরের জিনিস নিয়ন্ত্রিত আমদানির ফলে বিদেশী বাণিজ্য প্রথম দিকে বাধা পায়। মিশরীয়রা বিদেশ থেকে আমদানি-করা কাঁচামাল থেকে জিনিস তৈরি করে লাভবান হত। মিশরের বিদেশী বাণিজ্য রাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল। কালক্রমে সিরিয়ান, ক্রিটান ও সাইপ্রাসের ব্যবসায়ীদের ভীড় বাড়তে আরম্ভ করল। নীলনদে ফিনিসিয়ানদের নৌকোর আনাগোনা বেড়ে গেল। পরিবহণের ক্ষেত্রে স্থলপথ ও জলপথ দুই-ই ব্যবহার করা হত। প্রথমে মানুষ দিয়ে স্থলপথে পরিবহণের কাজ হত, পরে গাধা পরিবহণের কাজে লাগে। ঘোড়ার ব্যবহার আরও পরে হয়। নীলনদই জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকাল থেকেই নৌকোর প্রচলন মিশরে চলে আসছে।

পিরামিড ঃ পিরামিড হল চতুষ্কোণ সমাধি-মন্দির। মিশরের ফ্যারাওরা সাধারণ মিশরীয়দের মত বিশ্বাস করত—প্রতিটি জীবন্ত মানুষের মধ্যে দুটি আত্মা থাকে, যাকে বলা হয় "কা"।—মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর যদি তার দেহকে ক্ষুধা, হিংসা ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করা যায়, তবে তাঁর আত্মা বেঁচে থাকে। সেইজন্য তাঁরা মৃতদেহগুলি রক্ষার জন্য একটা উপায়
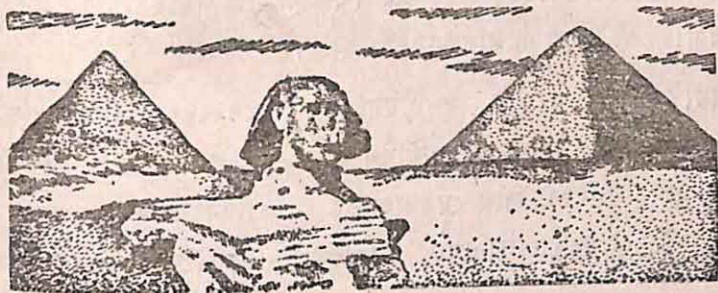
পিরামিড ও স্ফিঙ্কস্

বের করেন। প্রথমে একখণ্ড কাপড়ের গায়ে মলম লাগিয়ে মৃতদেহকে সেই কাপড়ে জড়াতেন। তারপর সেটাকে এক বিচিত্র শবাধারে শুইয়ে পিরামিডের গহ্বরে রেখে দিতেন। এইভাবে রাখা মৃতদেহকে বলা হত মমি। মৃতদেহের সঙ্গে তারা মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাদ্য, বস্ত্র ও জীবিতকালের ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে দিতেন। উচ্চতায়, গঠনে ও স্থান নির্বাচনে পিরামিড হত স্থায়িত্বের নিদর্শন। পিরামিডকে শক্ত ও স্থায়ী করার জন্যে বড় বড় পাথর এমনভাবে সাজানো হত যে, দেখে মনে হবে রাস্তার পাশে এগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে।

পিরামিডের চারটি দিক ক্রমশ সরু হয়ে উঠত, পরে একটি বিন্দুতে মিশে যেত। দূর থেকে দেখে মনে হয় ত্রিকোণ আকার। মিশরের সব থেকে প্রসিদ্ধ পিরামিড হল ফ্যারাও খুফুর। এই পিরামিড প্রায় ২৬৫০ খ্রীঃ পূঃ ফ্যারাও খুফু কর্তৃক নির্মিত। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে তিন লক্ষ লোক কুড়ি বছর পরিশ্রম করে এই পিরামিড তৈরি করেছে। এই পিরামিড তৈরি করতে ২৫ লক্ষ পাথরের খণ্ড লেগেছে যার কয়েকটার ওজন ১৫০ টন করে। অর্ধলক্ষ বর্গফুট এলাকা নিয়ে এই পিরামিড, যার

উচ্চতা ৪৮১ ফুট। যেহেতু পিরামিডগুলি ফ্যারাওদের সমাধিক্ষেত্র, সেহেতু সেখানে মমির সঙ্গে থাকত অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র যা তাঁরা ব্যবহার করতেন। পিরামিডের দেওয়ালে নানা চিত্র আঁকা আছে। চিত্রগুলি থেকে আমরা প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

মিশরের স্থাপত্যের আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হল স্ফিঙ্কস্। ফ্যারাও খুফুর পিরামিডের কাছেই আছে এই স্ফিঙ্কস্, যার শরীর সিংহের মত, মাথা মানুষের। শরীরের তুলনায় মাথাটি ছোট।

ধর্মবিশ্বাস ঃ প্রাচীন মিশরীয়রা নানা দেবদেবীর পূজো করত। তাদের মধ্যে রি, এ্যামন ও ওসিরিস প্রভৃতি ছিল প্রধান। রি ছিলেন প্রথমে মৃত্যুর দেবতা, পরে দেবরাজ হন। এ্যামন ছিলেন প্রথমে বাস্তু দেবতা, পরে যুদ্ধের দেবতা হন। ওসিরিস ছিলেন দিনের দেবতা, সূর্যপুত্র।
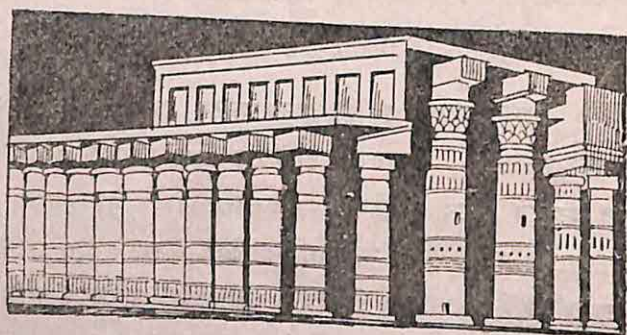
এ্যামন দেবতার মন্দির

মিশরীয়রা জীবজন্তুর মূর্তিকেও যেমন, শকুন, কুমীর, ষাঁড় ইত্যাদিকে দেবতা রূপে পূজো করত। এ ছাড়াও কতক স্থানীয় দেবদেবী থাকতেন। মিশরীয় ধর্মে মৃত্যুর পর আত্মায় বিশ্বাস ছিল। সেইজন্যই মৃত্যুর পর কবর দেওয়ার পদ্ধতি ছিল খুব জমকালো।

প্রধান জীবিকা ঃ কৃষিকাজই ছিল মিশরের বেশির ভাগ অধিবাসীর মূল জীবিকা। নীলনদের বন্যায় জমি উর্বর হত এবং তা ছাড়াও খাল কেটে জল এনে সারা বছর ধরে চাষ করা হত। প্রায় ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তারা পশু দিয়ে টানা লাঙল চালাত ও পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী কাস্তে

ব্যবহার করত। প্রধান শস্য ছিল গম, যব ও জোয়ার। মিশরীয়রা পশু-পালনও করত। ছাগল, কুকুর, গাধা, শূকর ও হাঁস ছিল সাধারণত গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ার। কালক্রমে ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর কারিগরের উদ্ভব হয়। মৃৎ-শিল্পী ও দক্ষ কাঠের ছুতোরমিস্ত্রীরা নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করত। মিশরে খুব সুন্দর সুন্দর পাথরের ফুলদানি তৈরি হত ও মনে হয় তা রপ্তানি করা হত। মেসোপোটে-মিয়ানদের মত তারা কাচ-তৈরির বিদ্যা আয়ত্ত করে ও নানারকম কাচের জিনিস তৈরি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে এক ব্যবসায়ীশ্রেণীর উদ্ভব হয়। তা ছাড়া মিশরে ছিল সুদক্ষ সরকারী কর্মচারিবৃন্দ; —করণিক, লেখক, কর-আদায়কারী ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন:

(ক) মিশরকে নীলনদের দান' বলা হয় কেন?

(খ) মিশরের ধর্ম, দেবদেবী ও পিরামিডের কাহিনী লেখ।

(গ) মিশরের চিত্রলিপি কি করে পড়া হয়?

(ঘ) মিশরের কয়েকজন বিখ্যাত রাজার নাম কর।

(ঙ) মিশরের শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা জান লিখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ | সিন্ধু উপত্যকা (The Indus Valley)

ভারতের প্রথম সভ্যতার উদ্ভব ঘটে ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। সিন্ধুনদের অববাহিকায় এই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল বলে একে সিন্ধু-সভ্যতা বলা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদরো (অর্থ মৃতের স্তূপ) নামক
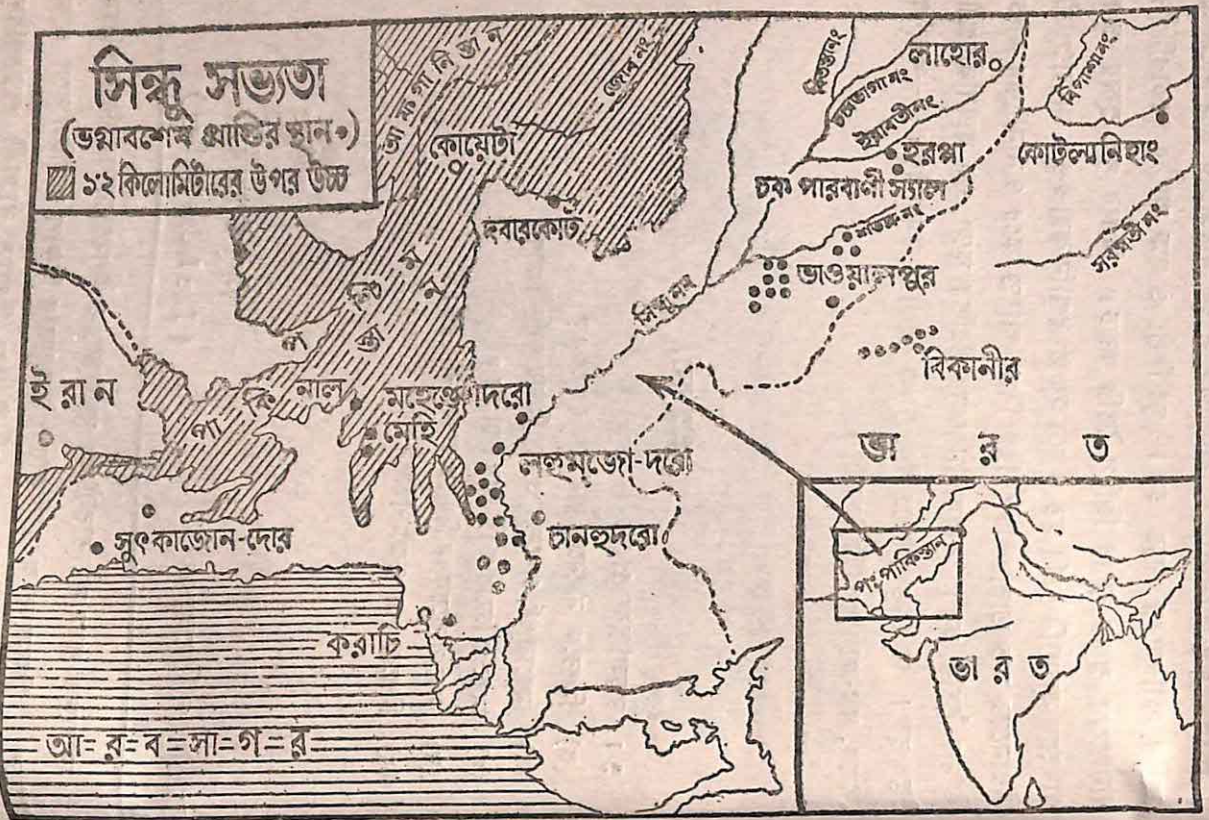
স্থানে এক বিশাল স্তূপ দেখতে পেয়ে খননকার্য শুরু করেন। এই খনন-

কার্যের ফলে বেরিয়ে পড়ে এক বিরাট শহরের ধ্বংসস্তূপ। সিন্ধু নদের উত্তরে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার হরপ্পায় আরও একটি শহরের ধ্বংসস্তূপ খনন করা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এই সব শহরের সভ্যতাকে সিন্ধু-সভ্যতা বলেন। গত কুড়ি বছর ধরে তাঁরা খনন করে অনেক প্রাচীন শহর আবিষ্কার করেছেন, যাদের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার মিল আছে। চণ্ডীগড়ের কাছে রূপার, আমেদাবাদের কাছে লোথাস, রাজস্থানের কাছে কালিবাগান ও সিন্ধুর কোট ডিজিতে এইসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশে, বালুচিস্তানে, প্রায় সমগ্র পাঞ্জাবে, উত্তর রাজস্থানে, কাথিয়াওয়াড়ে ও গুজরাটে। একে আমরা সভ্যতা বলি, কারণ এইসব অঞ্চলের মানুষ, আদিম মানুষ থেকে অনেক উন্নত জীবন যাপন করত। সিন্ধু-সভ্যতার সৃষ্টি ও বিকাশের প্রায় একই সময়ে মিশরে নীল নদ, মেসোপোটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস ও চীনদেশের হোয়াং হো নদীর অববাহিকায় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

শহর-গঠন প্রণালী : মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার শহরগুলি ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশ নির্মিত হয়েছিল উঁচু জমির উপর, যাকে বলা হয়
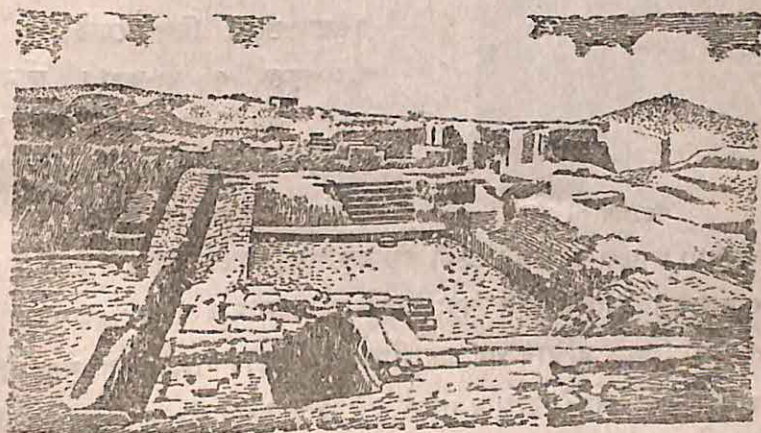
মহেঞ্জোদরোর স্নানাগার

দুর্গ এই অংশে ছিল সাধারণের জন্য দালান, শস্যাগার, প্রয়োজনীয় কারখানা ও ধর্মীয় দালান। শহরের অপর অংশ আরও বিস্তৃত ছিল।

সেখানে সাধারণ মানুষ বাস করত ও তাদের বৃত্তি ও পেশা অনুযায়ী কাজ করত। অনুমান করা হয় শহর আক্রান্ত হলে ও বন্যা এলে নীচু অংশের অধিবাসীরা দুর্গ অঞ্চলে আশ্রয় পেত।

হরপ্পার দুর্গ অংশে উল্লেখযোগ্য শস্যাগারগুলি ছিল। এইগুলো নির্মিত হয়েছিল চতুষ্কোণ জায়গায় ও নদীর কিনারায়। নদীপথে নৌকোয় শস্য এনে শস্যাগারে রাখা হত। মহেঞ্জোদরোতে একটি বড় দালান পাওয়া গেছে, যা মনে হয়, শাসকের বাসগৃহ ছিল। কাছেই আর একটি গৃহ হয়ত সভা-গৃহ বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হত। এই অঞ্চলের সুপরিচিত দালান হল বিখ্যাত স্নানাগার। এটি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গেছে।

মহোঞ্জোদরো শহরের নীচু অংশে বাড়ী তৈরির আগে সুপরিকল্পনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশস্ত ও ছোট-বড রাস্তা শহরটিকে নানা ভাবে বিভক্ত করেছিল। রাস্তার দু'পাশেই বাড়ীগুলো তৈরি করা হয়েছিল। বাড়ীগুলো ছিল ইঁটের তৈরী। দেওয়ালগুলো ছিল মোটা ও শক্ত প্রলেপযুক্ত ও রং-করা। জানালার সংখ্যা কম থাকলেও প্রচুর দরজা থাকত। দরজাগুলো সম্ভবত ছিল কাঠের। রান্নাঘরে আগুন জ্বালাবার আলাদা জায়গা ও মাটির তৈরী বড় বড় পাত্র পাওয়া গেছে। প্রতিটি বাড়ী ও দালানের সংলগ্ন ছিল পয়ঃপ্রণালী। স্নানাগারগুলির একপাশে পয়ঃপ্রণালী ছিল। রাস্তার পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে বাড়ীর পয়ঃপ্রণালী যুক্ত থাকত। রাস্তার পয়ঃপ্রণালী রাস্তার পাশে ইঁট দিয়ে তৈরি হত, যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায়। কিছু পয়ঃপ্রণালী বড় বড় পাথর দিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকত। প্রতিটি বাড়ীতেই উঠোন থাকত।
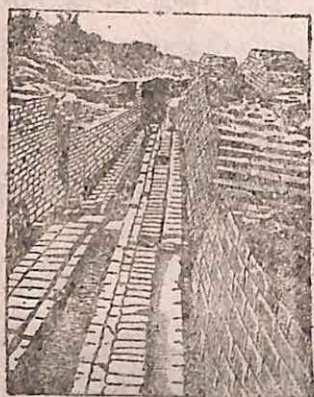
পয়ঃপ্রণালী

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস : সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অধিবাসীদের পেশা ও বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। অনুমান করা হয়

বেশির ভাগ লোকই ছিল কৃষিজীবী। এরই সঙ্গে তারা পশুপালন, ব্যবসা ও শিল্পকাজ করত। অধিবাসীরা যব, গম, মটরদানা, খেজুর ইত্যাদি উৎপন্ন

সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎশিল্প

করত। এগুলি ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। মাছ, মাংস ও ফল খেতে তারা ভালবাসত। যেসব জীবজন্তুর চিত্র পাওয়া গেছে, তা দেখে মনে হয় গোরু, ছাগল, ষাঁড়, কুকুর এমন কি হাতির সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। ঘোড়া ও ভেড়ার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে তুলোর চাষ হত। সে যুগের মানুষ সুতীর কাপড় বুনতে জানত। কতকগুলো মাটির মাকু আবিষ্কার থেকে মনে হয়, মেয়েরা বাড়ীতে সুতো তৈরি করত। পশমের তৈরী পোশাকও যে তারা ব্যবহার করত, তা জানা গেছে। মেয়েরা ঘাঘরা পরত ও মেখলা বাঁধত। পুরুষেরা সুতী কাপড় পরত ও চাদর ব্যবহার করত। সুতী ও পশম উভয় প্রকার পোশাকই ব্যবহার করা হত।

শিল্প : সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অধিবাসীরা দক্ষ মৃৎশিল্পী ও ধাতুশিল্পী ছিল। হরপ্পার মৃৎশিল্প বিস্ময়কর। মৃৎশিল্প নির্মিত হত চাকায়—যা উন্নত সভ্যতার নিদর্শন। এই মৃৎশিল্পই উন্নত শিল্পে মৃৎশিল্পীদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। হরপ্পার মৃৎশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন বড় বড় পাত্র, গলার কাছে সরু হয়ে গেছে। এইসব পাত্রের গায়ে ছিল নানারকম রংয়ের কাজ। বৃত্ত, ত্রিকোণ, গাছ-গাছালি, লতা-পাতা প্রভৃতি চিত্র মৃৎপাত্রের উপর আঁকা হত।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রচুর মাটির পুতুল খনন করে পাওয়া গেছে। অসংখ্য চাকাযুক্ত গরুর গাড়ীর মডেল ও লম্বা লম্বা কাঠির পা-যুক্ত পাখী ও নড়ে এমন ঘাড়যুক্ত ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া গেছে। এ যুগের অধিবাসীরা ধাতু-

মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত সীলমোহর
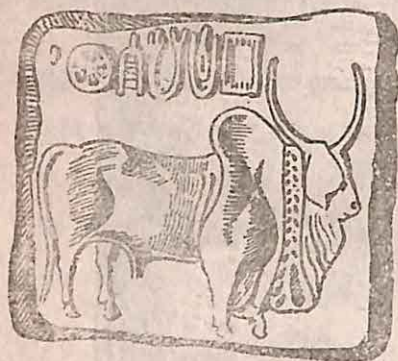
নির্মিত যন্ত্র, বাসনপত্র ও গহনা ব্যবহার করত। মৃৎশিল্পীর চাকায় নির্মিত বড় বড় ও বিভিন্ন রকমের মাটির পাত্রও তারা ব্যবহার করত। ব্রোঞ্জের নৃত্যরত একটি নারী-মূর্তি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গেছে যা বিশিষ্ট শিল্পের নিদর্শন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অসংখ্য জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কিত সীলমোহর আবিষ্কার করেছেন। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরতে পছন্দ
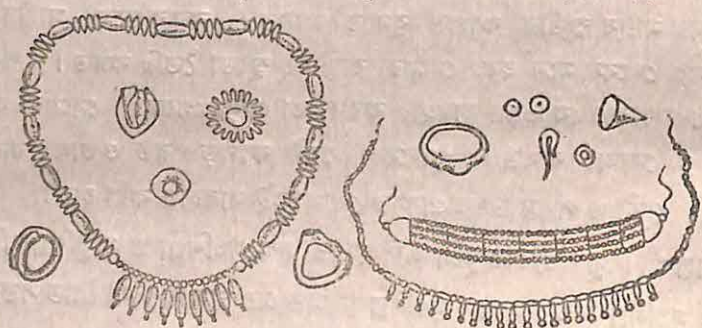
সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অলঙ্কার

করত। পুরুষেরা হাতবালা ব্যবহার করত। মেয়েরা কানপাশা, কোমরবন্ধ ও গলার হার ও অন্যান্য গহনা পরত। অলঙ্কার তৈরির জন্য সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ ও হাতির দাঁত ব্যবহার করা হত।

ব্যবসা ঃ সিন্ধু-সভ্যতার নানা জিনিস, যেমন—গলার হার, অলঙ্কার ও সীলমোহর মেসোপোটেমিয়ায় পাওয়া গেছে। এইসব দেখে মনে হয়, মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে সিন্ধু-অঞ্চলের ব্যবসা চলত। কি ধরনের বা কোন্ জিনিসের ব্যবসা চলত, তার কোনও লিখিত বিবরণ নেই। নদীর তীরে নির্মিত শস্যাগার থেকে অনুমিত হয় উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা হত। মূলত নদী ও সমুদ্রপথে এই বাণিজ্য চলত। টেলমুন ও পারস্য উপসাগরের বাহেরিন ছিল সিন্ধু উপত্যকা ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। আমরা অনুমান করি, সিন্ধু-অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা মৃৎপাত্র, খাদ্যশস্য, সুতীবস্ত্র, মসলা, পাথরের মালা, গহনা ইত্যাদি রপ্তানি করত ও নানারকম ধাতুর জিনিস আমদানি করত।

ধর্মবিশ্বাস ঃ এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় কোন মন্দির বা চৈত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। নানারকম জিনিস ও সীলমোহর দেখে অনুমান করা হয় তারা মাতৃপূজার পূজারী ছিল। অনেকগুলো মাটির মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে। কোন কোন সীলমোহরে বিরাট কুঁজযুক্ত একটি ষাঁড়ের মূর্তি দেখা যায়। অনুমান করা হয়, এই সীলমোহরগুলো পবিত্র ছিল। গাছ, বৃষ, পাথর, সাপ ও বিভিন্ন পশুপাখীকে তারা দেবদেবী হিসেবে পূজো করত। কতকগুলো সীলমোহরে পশুপতি শিবের মত মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি দেখতে যোগী পুরুষের মত। কেউ কেউ হয়ত শিবের উপাসক ছিলেন। পরলোকে তাঁদের বিশ্বাস ছিল। মৃতদেহ দাহ ও কবর দেওয়া উভয় প্রথাতেই করা হত।

পশুপতি

সমাজ ঃ সিন্ধু-সভ্যতার অনেক লিপি পাওয়া গেলেও আজ পর্যন্ত তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। বর্তমানে আমরা যা তথ্য পেয়েছি তার থেকে

সিন্ধু-সভ্যতার শাসন-প্রণালী ও সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যেহেতু কোনও প্রাসাদ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই হয়ত কোনও রাজা ছিল না। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বোধহয় শাসন করতেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন বড় বড় বাড়ীগুলো ছিল প্রাসাদ ও রাজারা সেগুলোতে বাস করতেন। বড় বড় বাড়ী ও সাধারণ ছোট ছোট বাড়ী দেখে অনুমান করা হয় সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার সময়ের বিভিন্ন ধরনের গহনা দেখতে পাওয়া যায়—সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ ও হাড় দিয়ে তৈরি ছিল সেগুলো। মূল্যবান সোনা ও রূপার গহনা মনে হয় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করত।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) কোন্ কোন্ অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতার প্রসার ঘটে? এই সভ্যতা কাদের সৃষ্টি? তাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) কোন্ বাঙ্গালী ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করেন? তিনি কেন খননকার্য শুরু করেছিলেন? এই খননের ফল কি হয়েছিল?

(গ) সিন্ধু-সভ্যতার নাগরিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) সিন্ধু-সভাতার যুগের অধিবাসীদের পোশাক ও অলঙ্কার সম্পর্কে যা জান লেখ।

(খ) সমসাময়িক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার কি মিল ছিল?

(গ) সিন্ধুবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে কি জান? তাদের সমাজব্যবস্থা কি রকম ছিল?

(ঘ) কিভাবে প্রমাণ করা যায় যে সিন্ধু-সভ্যতা যুগের মানুষ সভ্য ছিল?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীন (China)

সিন্ধু উপত্যকার মতো চীনের হোয়াং হো এবং ইয়াংসি কিয়াং নদের উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। চীনের উত্তর অঞ্চল দিয়ে হোয়াং হো বা পীত নদী ও দক্ষিণের উর্বর অঞ্চল দিয়ে ইয়াংসি কিয়াং নদ

প্রবাহিত। এই দুই নদী-উপত্যকায় জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, বর্বরদের বাধা দিয়ে বন্যা ও অনাবৃষ্টি জয় করে চীনের সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে।

চীনারা কোথা থেকে চীনে এসেছে, তারা কোন্ জাতের বা তাদের সভ্যতা কতদিনের পুরানো, তা জানা যায়নি। আদি মানবের চিহ্ন পিকিং শহরের কাছে পাওয়া গেছে। হোনান ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় পাওয়া জিনিসপত্র থেকে জানা যায় চীনের নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি, মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা থেকে এক বা দু'হাজার বছর পরে শুরু হয়েছিল। চীনের সভ্যতা নানা মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় চীনের প্রাচীন শিল্প মেসোপোটেমিয়া ও তুর্কিস্তান থেকে এসেছিল। হোনানে আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের সঙ্গে সুসা ও এনার্ড-এর মৃৎশিল্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। চীনের অধিবাসীদের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ানদের মিল থাকলেও, মঙ্গোলিয়া দক্ষিণ রাশিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত শত শত অভিযানকারী ও দেশত্যাগী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে চীনারা গড়ে উঠেছিল।

পুরাণ কথা : চীনের প্রাচীন ইতিহাস পুরাণ কাহিনীর মধ্যে মিশে আছে। চীনের পুরাণে আছে যে, পান-কু নামে জনৈক মহাপুরুষ বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনিই প্রথম মানুষ। তাঁর ইচ্ছায় অনন্ত আকাশে জগতের সৃষ্টি হল। চীনের সমস্ত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা তাঁরই সৃষ্টি। পান-কু নাকি আঠারো হাজার বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর নিশ্বাস থেকে বায়ু ও মেঘের সৃষ্টি হয়, তাঁর চুল থেকে তৃণলতা ও তাঁর দেহের হাড় থেকে ধাতু এবং ঘাম থেকে বৃষ্টি হয়। সৃষ্টি করতে করতে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েন, তাঁর গায়ে পোকা জন্মায় ; সেই পোকাই হল মানুষ।

চীনের প্রাচীন উপাখ্যানে পাঁচ রাজার কাহিনী আছে। বলা হয়,'এই পাঁচ রাজাই নাকি চীন দেশকে সভ্য করে তোলেন। প্রথম রাজার নাম ফু-সি, তাঁর সময়কাল হল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে। তিনি তাঁর রানীর সাহায্যে চীনদেশে বিহারের নিয়ম, মাছধরা, পশুপালন, লিপি অঙ্কন ইত্যাদি শিখিয়েছেন।

দ্বিতীয় রাজা শেং-নু চীনের বিশ্বকর্মা বলে স্বীকৃত। তিনি হাল-লাঙল

তৈরি করেন। চাষ করে শস্য, ফল-ফুল জন্মালেন। লতাপাতা ও গাছ থেকে ঔষধ তৈরি করতে শেখালেন।

তৃতীয় রাজা হোয়াং-টি ছিলেন চীন দেশের "হলুদ রাজা"। তিনি হোয়াং হো নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। হোয়াং-টি শেখালেন অক্ষর (চিত্রাক্ষর)। তাঁর সময়ে তৈরী হল ইটের বাড়ী, কাঠের নৌকো, চাকাওয়ালা গরুর গাড়ী। তিনি আবিষ্কার করেছেন চুম্বক-পাথর ও দিন-ক্ষণ-মাস দেখার পঞ্জিকা। তাঁর স্ত্রী গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করেন।

চতুর্থ রাজা ইয়াও চীনাদের নক্ষত্রদের গতি লক্ষ্য করতে শেখালেন। তিনি তৈরি করেছেন মান-মন্দির। ইয়াও সম্পর্কে জ্ঞানী কন্‌ফুসিয়াস খুব প্রশংসা করেছেন।

পঞ্চম রাজা শুন হোয়াং হো নদীর উপর বাঁধ বেঁধে বন্যা থেকে চীনাদের রক্ষা করেছেন। খাল কেটে ও বন, জলাভূমি পরিষ্কার করে তিনি চাষের উন্নতি করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী 'য়ু' ন'টি বড় নদীর মুখ খুলে স্রোতকে সমুদ্রের দিকে পরিচালিত করে দেশকে বন্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সম্রাট শুন তাঁকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। 'য়ু' আট বছর রাজত্ব করে রাজ্য ত্যাগ করেন। তাঁর পর প্রজারা তাঁর ছেলে 'চি'কে রাজপদে বসায়। সেই থেকেই বংশানুক্রমিক রাজা প্রথা পুনরায় শুরু হল।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) চীনের উপকথা থেকে চীনের সভ্যতার জন্মকথা লেখ।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) চীনের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে বিশ্বের প্রথম মানুষ কে? তিনি কিভাবে বিশ্বের সৃষ্টি করেন?

(খ) চীনের প্রাচীন উপাখ্যানে পাঁচ রাজা বলতে কাদের বলা হয়? তাঁদের নাম লেখ।

(গ) চীনের প্রাচীন উপাখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় রাজার নাম কি ছিল? তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কি?

(ঘ) চীনের কোন্ অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণে চীনা জাতির সৃষ্টি হয়? আনুমানিক কোন্ যুগে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(ঙ) চীনের তৃতীয় রাজার নাম কি ছিল? তাঁকে চীনারা কি নামে অভিহিত করে? তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান লিখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদী-উপত্যকার সভ্যতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রায় ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ানসাগর, সিন্ধু উপত্যকা, চীনের হোয়াং হো উপত্যকা, ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও মিশরের নীলনদের অববাহিকা অঞ্চল সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতিটি সভ্যতা নিজস্বভাবে গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঃ প্রতিটি সভ্যতায় কৃষককে তার প্রয়োজনের বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে হত। নব্য প্রস্তর যুগে তা সম্ভব ছিল না, কারণ জমির পরিমাণ ছিল কম। লাঙল ও সেচ-ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে বেশী করে উৎপাদন সম্ভব হল। কাঠের লাঙলের সাহায্যে অনেক বেশী জমি চাষ করাও সম্ভব হল। সেচের প্রয়োজনও সভ্যতার উন্মেষে সাহায্য করে। নদীর কাছের জমি চাষের উপযুক্ত করার জন্য পরিষ্কার করা হল। সেচের খাল খনন ও নদীতে বাঁধ দেবার জন্য সমাজের প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। একটি ছোট গ্রামের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। এই প্রয়োজন মেটাতে কয়েকটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়।

নদী-উপত্যকার সভ্যতাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো শহরের উত্থান। কৃষির উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার ফলে কিছু লোক খাদ্য উৎপাদন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারা শহরে বাস করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে থাকে। প্রাচীন শহরের অধিবাসীদের খাদ্য তারা নিজেরা উৎপাদন করত না। গ্রামে যে খাদ্য উৎপাদন হত, তা শহরে আনা হত। গ্রামের কৃষকদের সেইজন্য নিজেদের প্রয়োজনের থেকেও বেশী উৎপাদন করতে হত। এই সভ্যতাগুলিতে ব্যবসাও শুরু হয়। অপরের তৈরী জিনিস মানুষ চাইত ও তার বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে হত। প্রাচীনকালে বিনিময়-ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা চলত। ক্রমে মুদ্রা-ব্যবস্থার সূত্রপাত হল। শহর-জীবনের ফলে ব্যবসা ও মুদ্রা-ব্যবস্থা শুরু হল। ব্যবসা ক্রমে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে

আরম্ভ হল। এর ফলে জল ও স্থল পথে পরিবহণ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। চাকার আবিষ্কারের ফলে পরিবহণ-ব্যবস্থা আরও দ্রুত হল। পথঘাটের অসুবিধার জন্য তখন ভারবহনকারী পশুই পরিবহণের জন্য ব্যবহার করা হত।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য : শহরের অধিবাসীদের খাদ্য উৎপাদন করতে হত না। তাই তারা অন্য কাজ করতে পারত। এইভাবে কিছু কিছু লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় ও বৃত্তিতে দক্ষ হয়ে উঠল। ক্রমেই কারিগর ও ব্যবসায়ী, সৈনিক ও কর্মচারীশ্রেণী তাদের নিজের পেশা ও বৃত্তিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে লোকে নতুন দক্ষতা ও নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠল। এইভাবে সমাজে এল শ্রম-বিভাজন। এরই ফলে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজ করত ও বাসও করত ভিন্ন রকমে। শ্রেণী অনুসারে লোকের অধিকারও ভিন্ন হত। সভ্যতার উন্মেষের ফলে সমাজে অনৈক্য শুরু হল। সমাজে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভব হল। কৃষক ও কারিগররা সমাজে খুব নীচু অর্থ নৈতিক মর্যাদা পেত। এইসব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখলে দেখা যায়, বড় বড় প্রাসাদে শাসক, ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বাস করছে ও গরীবরা বাস করছে বস্তি অঞ্চলে।

যখন মানুষ শহরে বাস করতে শুরু করল ও ভিন্ন ভিন্ন পেশায় বিভক্ত হয়ে গেল, তাদের স্বার্থও এক থাকল না। শহর-জীবন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল। জনজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ওপর শৃঙ্খলা রক্ষা, আইন তৈরি ইত্যাদি দায়িত্ব থাকল। কালক্রমে প্রতিটি সভ্যতায় শাসক ও রাজার আবির্ভাব হল।

সরকারের মত উন্নত প্রতিষ্ঠানের আইন তৈরি ও লিপিবদ্ধ করতে হত, হিসেব রাখতে হত, বিবাদ মেটাতে হত ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। এরই ফলে লেখনির প্রয়োজন দেখা দেয়। লিপির আবিষ্কার প্রতি নদী-উপত্যকা সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি নদী-উপত্যকায় গড়িয়া উঠিবার কারণ কি ?

(খ) পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি কি ?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) রাষ্ট্র বা সরকারের সৃষ্টি হয় কখন ও কেমন করে ?

(খ) সমাজে রাজার আবির্ভাব হল কি করে ? আইন প্রণয়ন করত কারা ?

(গ) প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সমাজে শ্রেণীভেদ প্রথা দেখা দেয় কখন? সমাজে কয়টি শ্রেণীর লোক থাকত ? তাদের সম্পর্ক ছিল কেমন ?

(ঘ) প্রাচীন সভ্যতাসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যের সৃষ্টি হয় কি করে ?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

লৌহযুগের সমাজসমূহ
(Iron Age Societies)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি তামা ও মিশ্র ধাতু ব্রোঞ্জ যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য ব্যবহার করা হত। সুতরাং, সেই সভ্যতাসমূহকে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা বলা হয়। লৌহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এর পরবর্তী অগ্রগতি ঘটল। লৌহ তামা ও ব্রোঞ্জ থেকে শক্ত, দামেও সস্তা এবং পাওয়াও যায় প্রচুর। ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কোন কোন সমাজ লোহার ব্যবহার জানত। কিন্তু, খ্রীঃ পূঃ ১৪০০তে লোহা গলাবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। হিট্টাইট, —যারা এশিয়া মাইনরে বাস করত, লৌহা তৈরির কৃতিত্ব তাদেরই। লৌহযুগের সূত্রপাত হয় ১২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যখন লোহার তৈরী-যন্ত্রপাতি প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরান, ইরাক ও গ্রীসে ব্যবহার করা হত। লোহা আবিষ্কারের ফলে নানারকম কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি যেমন লাঙলের ফলা, কাস্তে, বেলচা, কোদাল, কুড়োল ইত্যাদি প্রচুর তৈরি করা সম্ভব হল। জঙ্গল কাটা ও পরিষ্কারের জন্য লোহার কুড়োল ব্যবহার করে অনেক চাষের জমি উদ্ধার করা হল। কৃষিকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। অন্যান্য শিল্পেও লোহা আবিষ্কারের প্রভাব অপরিসীম। বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি হল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নানারকম লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন ; যেমন—হাতুড়ি, বাটালি করাত, গজ ইত্যাদি। এইসব যন্ত্রপাতি দেখে মনে হয়, এই সময় সমাজে শ্রম-বিভাজন ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে লোহার তৈরী অস্ত্র বিপুলভাবে ব্যবহার করা হতে থাকে। লোহা আবিষ্কার ও ব্যবহারের সাথে সাথে সভ্যতার বিস্তার ঘটল ও অনেক নতুন নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব : লোহা আবিষ্কারের ফলে শহর ও নগরের সংখ্যা বেড়ে যায়। শাসক ও অভিজাতরা সাধারণত শহর ও নগরে বাস করত। সভ্যতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। লৌহযুগে এই বিভেদ আরও বেড়ে গেল। সমাজে যারা খাদ্য উৎপাদক ও

সম্পদের স্রষ্টা, তারা নীচু শ্রেণীতে নেমে গেল। অবশ্য এই অসাম্যের মাত্রা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কম-বেশি ছিল। কোনও কোনও সভ্যতায় যুদ্ধবন্দী দাস বা ঋণ নিয়ে শোধ না-করা দাসরা উৎপাদনের কাজ করত। গ্রীস ও রোমে এইরকম হত। ভারতবর্ষের সমাজে ছিল জাতিভেদ। এই যুগের সমাজগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজে শ্রেণীভেদ। কিন্তু এই যুগের আর এক বড় অবদান জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি। এই যুগে লিপি ও ভাষার যে উন্নতি হয়, তা ভবিষ্যতে আধুনিক ভাষার ভিত্তি রচনা করে। সাহিত্য মানুষের জীবনে বিশেষ স্থান নেয় ও সর্বপ্রথম বিখ্যাত কবিতা, নাটক, ব্যাকরণ ও দর্শন লেখা এই যুগেই শুরু হয়। লেখনিকে শুধুমাত্র হিসেব রাখার জন্য ব্যবহার না করে মনের ভাব বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করা হতে থাকল। দর্শন ও বিজ্ঞান পাঠের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। শিল্প ও স্থাপত্যে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল এই লৌহযুগে। এই যুগে পৃথিবীর আধুনিক ধর্মমতগুলি প্রচারিত হয়।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জমি কৃষিকাজের আওতায় আসে, বহু শহর ও নগরের পত্তন হয়। এই শহর ও নগরগুলো নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করে। সমাজে বিশেষ বিশেষ কারিগর ও যন্ত্রপাতির আবির্ভাব হয়। ফলে শিল্প-ব্যবস্থারও দ্রুতগতিতে উন্নতি হতে থাকে। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রচুর বিকাশ হয়। এক জায়গার তৈরী জিনিস অন্য জায়গার জিনিসের সঙ্গে বিনিময় হতে থাকে। এর ফলে জলে ও স্থলে পরিবহণের আরও উন্নতি হয়। ব্যবসার প্রসারের ফলে বিনিময়-ব্যবস্থার বদলে মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু হয়। বেশী মাত্রায় মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় দেখা গেল, জিনিসপত্র এখন আর শুধু স্থানীয় বাজারের জন্য তৈরি না হয়ে বৃহৎ বাজারের জন্য তৈরি হচ্ছে।

রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঃ সভ্যতা-সৃষ্টির সাথে সাথে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি সমাজ-জীবনে জটিলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লৌহযুগে প্রতিটি সরকারের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকত। এই সেনাবাহিনী প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করা, যুদ্ধ করা ও অন্য রাজ্য দখলের জন্য ব্যবহার করা হত। একটি গোষ্ঠীর অধিপতি যখন পার্শ্ববর্তী

গোষ্ঠীগুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করত, তখন প্রথম গোষ্ঠীপতি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করত। এইভাবে সমাজে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে যুদ্ধ করে রাজ্য বাড়িয়ে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই যুগে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ হত। এই যুগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থারও সূত্রপাত হয়, যেমন—সাধারণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, মুষ্টিমেয়তন্ত্র ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) লৌহের আবিষ্কার কিভাবে সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল ?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) সমাজে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয় কি করে ?

(খ) লৌহ আবিষ্কারের ফলে কি কি যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | ব্যাবিলন (Babylon)

সভ্যতা, জীবনের মত সব সময়েই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আমাদের জীবনে যেমন আমরা পুরাতনকে ত্যাগ করে নতুনকে বরণ করে নিই, সভ্যতাও ঠিক সেইরকম বেঁচে থাকে নতুন নতুন জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে। মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা উর অঞ্চল থেকে সরে এসে ব্যাবিলনে প্রসারিত হয়। ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সুমের ও আক্কাদ অঞ্চলের সভ্যতার মিলনের ফলে। সুমের ও আক্কাদ-এর মধ্যে যুদ্ধে আক্কাদ জয়লাভ করে ও নিম্ন মেসোপোটেমিয়ার ব্যাবিলন হয় নতুন রাজধানী। ব্যাবিলনের ইতিহাসের শুরুতে দাঁড়িয়ে আছেন বিখ্যাত নরপতি হাম্মুরাবি, যিনি বিজেতা ও আইনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে সমুজ্জ্বল।

কৃষিকাজ ও বাণিজ্য : ব্যাবিলন রাজ্যের কিছু অংশ তখনও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকলেও বাকি অংশে কৃষিকাজ হত। বেশির ভাগ জমিই চাষ করত

প্রজা বা দাসরা। কিছু কিছু কৃষক জমির মালিকও ছিল। প্রাচীনকালে পাথরের অস্ত্র দিয়ে জমি খোঁড়া বা মাটি ভাঙ্গা হত। ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ব্যাবিলনে লাঙল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে তৎকালীন সীলমোহরে। মিশরের মত ব্যাবিলনে নদীর বাড়ন্ত জল জমিতে ঢুকতে দেওয়া হত না। প্রতিটি কৃষি-ক্ষেতকে বাঁধ দিয়ে নদীর প্লাবনের হাত থেকে বাঁচানো হত। অসংখ্য খাল কেটে নদীর বাড়তি জল একটি জলাশয়ে আনা হত। সেখান থেকে প্রয়োজনমত জল ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া যেত। এইভাবে জল পেয়ে জমি থেকে নানা রকমের শস্য, ডাল, সবজি ও ফল ইত্যাদি উৎপন্ন হত। সব থেকে বেশী হত খেজুর। সূর্য ও মাটির দয়ায় ব্যাবিলনীয়রা খেত রুটি, মধু, পিঠা (কেক), আরও সব সুস্বাদু খাবার। মেসোপোটেমিয়া থেকে আঙ্গুর ও জলপাই-এর চাষ গ্রীস ও রোমে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুধও এই সময় একটি বিশিষ্ট পানীয় ছিল। মাংস কদাচিৎ পাওয়া গেলেও খুবই মূল্যবান খাদ্য ছিল, কিন্তু মাছ পাওয়া যেত অফুরন্ত।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর লোক তখন মাটি কেটে তেল, তামা, সীসা, লোহা, রূপো, সোনা বের করছে। হাম্মুরাবির রাজত্বকাল পর্যন্ত যন্ত্রপাতি পাথরের ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর আগে থেকে ব্যাবিলনে প্রথমে ব্রোঞ্জ ও তারপরে লোহার আবির্ভাব হয়। ব্যাবিলনীয়রা ধাতু-ঢালাই বিদ্যাও আয়ত্ত করে নেয়। কাপড় সাধারণত তুলো ও পশমে বোনা হত। কাপড়কে নানা রঙে ছাপানো হত ও নানারকম সুঁচের কাজ করা হত। তুলো ও পশমের কাপড় এত সুন্দর হত যে, তার বেশির ভাগই রপ্তানি করা হত।

স্থানীয় পরিবহণের জন্য গাধা দিয়ে টানা চাকার গাড়ী ব্যবহার করা হত। ঘোড়ার উল্লেখ প্রথম দেখতে পাওয়া যায় ২১০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। জলপথে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীপথে জিনিস আনা-নেওয়া করা হত। পরিবহণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর প্রসার হয়। ব্যবসা ক্রমশ স্থানীয় এলাকা পেরিয়ে বিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ব্যাবিলন নিকট প্রাচ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্যাবিলনের খ্যাতনামা শাসকদের চেষ্টায় রাজ্যে অনেক বড় বড় সড়ক তৈরি হয়েছিল।

তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীরা তাদের জিনিস ব্যাবিলনের বাজারে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষ থেকে ব্যবসায়ীরা আসতেন কাবুল, হিরাট, একবাটানা হয়ে ; মিশর থেকে আসতেন পেলুসিয়াম ও প্যালেস্টাইন হয়ে ; এশিয়া মাইনর থেকে আসতেন টায়ার, সিডন, কারকেমিস্ পর্যন্ত ও তারপরে ইউফ্রেটিস নদী ধরে ব্যাবিলনে। এর ফলে ব্যাবিলন এক সদাব্যস্ত ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্যবসার উন্নতি হলেও নানাদিক থেকে বিপদ ছিল—চোর ডাকাতের ভয় ও রাজার শুল্ক আদায়কারীদের অত্যাচার। তখনও মুদ্রার প্রচলন ছিল না। পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য রূপো ও সোনার টুকরো ব্যবহার করা হত। তখন ব্যাঙ্ক না থাকলেও কতকগুলো পরিবার বংশপরম্পরায় টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করত। তারা জমি কেনা-বেচা ও শিল্পেও টাকা লগ্নী করত। এইভাবে ব্যাবিলনের সভ্যতা বাণিজ্যিক সভ্যতায় পরিণত হয়।

মন্দিরসমূহ ও পুরোহিতশ্রেণী : ব্যাবিলনের রাজারা দেবতাদের জন্য বড় বড় মন্দির তৈরি করে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। মন্দিরগুলি পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে তৈরি হত। মন্দিরের সামনে চকচকে পাথর লাগানো থাকত বলে দেওয়ালগুলো দেখতে ভাল লাগত। মন্দিরের আসবাব ও অন্যান্য খরচের জন্য প্রচুর অর্থও দেওয়া হত। দেবতার নামে ও মন্দিরের জন্য প্রচুর করও আদায় করার প্রথা ছিল। প্রতিটি মন্দিরে খরচের জন্য প্রচুর করও আদায় করার প্রথা ছিল। প্রতিটি মন্দিরে প্রচুর সোনা, রূপো, তামা আর মূল্যবান পাথর প্রভৃতি সঞ্চিত থাকত। প্রধান মন্দির ছিল দেবতা মার্দুকের মন্দির। এর থেকে কিছু দূরেই ছিল "জিগুরাত"।

রাজা ছিলেন ভগবানের প্রধান প্রতিনিধি। রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করত পুরোহিতশ্রেণী। পুরোহিতরা মন্দিরের সম্পত্তি নিজেরা ব্যবহার করতে পারতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করে ও নানা কাজে ঋণ দিয়ে তারা মন্দিরের সম্পদ বাড়াতেন। নানা রকমের জিনিস তাঁরা মন্দিরের দোকান থেকে বিক্রি করতেন। পুরোহিতরা আইনজীবীদের মত চুক্তিপত্র তৈরি করা, সরকারী দলিলপত্র রাখা, উইল প্রস্তুত করা ইত্যাদি

নানা ধরনের কাজ করতেন। পুরোহিত পরিষদ একত্রিত হয়ে রাজাকে পদচ্যুতও করতে পারতেন।

ব্যাবিলনে নানা দেবদেবীর আরাধনা করা হত। প্রতি গ্রাম ও শহরে ছিল স্থানীয় দেবতা। প্রধান দেবতার মধ্যে ছিলেন অনু (অগ্নি দেবতা), সাহামাস (সূর্য দেবতা), নান্নার (চন্দ্র দেবতা), বেল (পৃথিবীর দেবতা)। কালক্রমে রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে একটি দেবতার কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়। দেবদেবীর সংখ্যা কমে গিয়ে ব্যাবিলনের দেবতা মার্দুক অন্যান্য দেবতার উপর প্রধান দেবতার স্থান পায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : সরকারী কাজকর্ম, ব্যবসায়িক লেন-দেন প্রভৃতি কাজের জন্য আজকালের মত সেই সময়ও লেখাপড়ার প্রয়োজন হত। ব্যাবিলনের ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যে পড়াশোনা করত, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্যাবিলনের মন্দিরগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। ছাত্ররা সেখানে গণিত, জ্যামিতি, স্বাস্থ্যবিদ্যা ইত্যাদি পড়াশোনা করত। তাদের প্রিয় বিষয় ছিল ভূগোল। কাঁচা মাটির উপর শক্ত কাঠি দিয়ে তারা অক্ষর আঁকত—লেখাশেষে পাত্রটিকে পুড়িয়ে রেখে দিত। এই রকম প্রচুর পাত্র ব্যাবিলনের মন্দির ও প্রাসাদে পাওয়া গেছে, কিন্তু তার বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। রাজা অসুরবাণী পালের গ্রন্থাগারে ৩০,০০০ এই রকম মাটির ওপর লেখা পাত্র পাওয়া গেছে। এই রকম পাত্র থেকে গ্রীসের হোমারের মত ব্যাবিলনের কবি গিলিমাসের কবিতা পাওয়া গেছে। ব্যাবিলনীয়রা তাদের লেখনী সাহিত্য থেকে বাণিজ্যেই বেশী ব্যবহার করেছে। ব্যাবিলনের সৌন্দর্য-চেতনা দেখতে পাওয়া যাওয়া যায় তার ব্রোঞ্জ, লোহা, সোনার গহনায়, সূচীশিল্পে, আসবাবপত্রে। অঙ্কনরীতি খুব উন্নত ছিল না। দেওয়াল-চিত্র ও মূর্তি-রচনায় স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যবসার প্রতি আকর্ষণ থাকায় ব্যাবিলনীয়রা বিজ্ঞানে সাফল্য লাভ করেছে। বাণিজ্য তৈরি করেছে, অঙ্কশাস্ত্র ও ধর্ম তৈরি করেছে জ্যোতির্বিদ্যা। তারা পৃথিবীর অক্ষ-রেখাকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেছিল; আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীকে ১২ ভাগে ভাগ করে নাম দিয়েছিল রাশি। তারাই প্রথম চাঁদের গতি দেখে সময়গণনার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। সময়কে তারা বারো মাসে,

মাসকে দিনে ও দিনকে আবার বারো ঘণ্টায় ভাগ করেছিল। ঘণ্টাকে দুই ভাগে ও প্রতিটি ভাগকে ত্রিশ অংশে (মিনিটে) ভাগ করেছিল। তারা সংখ্যাকে এক শ’ পর্যন্ত না গুণে ষাট পর্যন্ত গুণত। তারপর আবার এক, এক, দুই, তিন আরম্ভ করত।
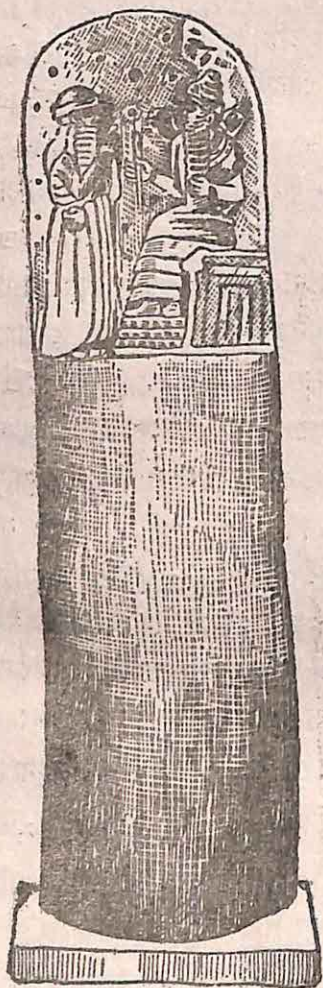
হাম্মুরাবির আইন-সংগ্রহ

হাম্মুরাবির আইন-সংগ্রহ : হাম্মুরাবির আইন-সংগ্রহ সুসা শহরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। বলা হয়, রাজা হাম্মুরাবি (২০৬৭-২০২৫ খ্রীঃ পূঃ) এই আইনগুলো সূর্যদেবতা সাহামাসের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

এর মুখবন্ধে তিনি দেবতাদের প্রশস্তি করে বলেছেন, তিনি রাজ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, দুষ্টকে দমন, দুর্বলকে রক্ষা ও জনসাধারণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন। মোট ২৮৫টি আইন ছিল। আইন-সংগ্রহ থেকে জানা যায়, রাজতন্ত্র সামন্ত ও ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করত। ব্যবসায়ীরা ক্রমে জমিদারদের স্থান নেয় ও তারাই জনসাধারণ ও রাজার মধ্যে মধ্যস্থতা করত। হাম্মুরাবির আইন-সংগ্রহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে ব্যাবিলনের সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। জমিদার, পুরোহিত ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল ও এইসব শ্রেণীর স্বার্থ ভালোভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। আইন-সংগ্রহে অনেক বৃত্তির উল্লেখ আছে; যেমন—মৃৎশিল্প, পাথর-মিস্ত্রী, চামড়া শিল্প

পোশাক তৈরি ও লৌহশিল্প। এইসব বৃত্তির পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্ররা সম্পত্তির সমান ভাগ পেত। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা যায়, হয় রাজা না হয় পুরোহিতশ্রেণী বেশির ভাগ লেনদেন করছেন। তাঁদের নির্দেশ ব্যবসায়ীরা কার্যকর করতেন। বিদেশ-রাষ্ট্রের সঙ্গে মূলত শস্য, গোরু, ছাগল, রূপো ও তামার ব্যবসা হত। এই আইন-সংগ্রহ থেকে ব্যাবিলনের দাসদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ঋণ-দাসত্ব বলে একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, যে ঋণ নিত সে নিজের বা ছেলেমেয়ের পরিশ্রম দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করত। এই দাসত্ব সারাজীবন স্থায়ী হতে পারত। কিন্তু হাম্মুরাবি সেই সময় কমিয়ে তিন বছর করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে মিশর
(Egypt as an Imperial Power)

ঐতিহাসিকরা মিশরের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন—পুরানো রাজত্ব, মধ্য রাজত্ব ও নতুন রাজত্ব। পুরানো রাজত্বকে বলা হয় পিরামিডের যুগ। এই সময় বর্তমান কায়রো শহরের কাছে "মেমফিস" ছিল মিশরের রাজধানী। মিশরের সভ্যতা, শিল্প, ধর্ম ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয় ৩০০০-২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মধ্য রাজত্বের সময়ে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে হাইকসস্‌ নামে এক পশুপালক যাযাবর জাতি মিশর দখল করে নেয়। তারা শহর পুড়িয়ে, মন্দির ভেঙ্গে ও জমানো অর্থ নষ্ট করে দুশো বছর মিশরে রাজত্ব করে।

সাম্রাজ্য বিস্তার : মিশরীয়রা স্বাধীনতা সংগ্রাম করে হাইকসস্‌দের বিতাড়িত করে ও শুরু হয় মিশরের নতুন রাজত্ব। এই যুগে মিশর সাম্রাজ্যে পরিণত হল। ফ্যারাও আহমোস মিশরকে হাইকসস্‌দের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের পিছনে তাড়া করতে করতে নিকট প্রাচ্যের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিনি নুবিয়া অধিকার করেন। কিন্তু মিশরের এই সামরিক শক্তির

প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৃতীয় থুটমোস। তিনি এশিয়াতে ১৭টি অভিযান করে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ও নুবিয়া অধিকার করে নেন। শুধু করদানে এই রাজ্যগুলোকে রেহাই না দিয়ে, যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই তাঁর সেনাবাহিনী ও শাসক রেখে এসেছেন। পরাজিত রাজ্যগুলো অধিকারে রাখার জন্য তৃতীয় থুটমোস একটি সুগঠিত নৌ-বাহিনী তৈরি করছিলেন। এই সব অভিযানের ফলে সম্রাটের কোষাগারে ও শস্যাগারে প্রচুর সম্পদ জমা হয়। সম্পদশালী হওয়ায় মিশরের শিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এই সময় মিশরের নতুন রাজধানী থিভসে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারও হয়। ফ্যারাওরা এই যুগে যুদ্ধের ফলে পাওয়া সম্পদের কিছু অংশ মন্দিরে দিতেন। মন্দিরগুলোর অধিকারও ছিল প্রচুর। রাজধানী থিভসের সব থেকে বড় ও জনপ্রিয় দেবতা 'এ্যামন' রা'র মন্দিরকে বিজিত লেবানন অঞ্চলের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে পুরোহিতশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

তৃতীয় থুটমোস

ফ্যারাও ইখ্‌নাটন (ফ্যারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ ১৪২৪—১৩৮৮ খ্রীঃ পূঃ) এই অবস্থা দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মসংস্কারে হাত দিলেন। বহু দেবতার উপাসনা ত্যাগ করে একটি দেবতার পূজার ব্যবস্থা করা হল, তিন হলেন সূর্যদেবতা এটন। রাজ্যজুড়ে এটনের মন্দির তৈরি করা হল ও ফ্যারাও নাম নিলেন ইখ্‌নাটন বা এটনের প্রিয়। তিনি রাজধানী থিভস্ পরিত্যাগ করে এ্যাখেটাটনে নতুন রাজধানী তৈরি করালেন। তাঁর এই ধর্মসংস্কার ক্ষণস্থায়ী হল। তিনি বুঝতে পারেননি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনসাধারণ তাঁর সংস্কার গ্রহণ করবে না। অল্পদিনের মধ্যে ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নানা অশান্তি শুরু হল ও পার্শ্ববর্তী

রাজ্যগুলির আক্রমণে মিশরের অধীনস্থ রাজ্যগুলো হাতছাড়া হবার উপক্রম হল। শাসকরা বারবার সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হলেন। রাজ্যগুলো চলে যাওয়ায় বিদেশ থেকে আয় কমে যায় ও রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। এই অবস্থায় ইখ্‌নাটন মারা গেলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা টুটেন খামন্ সিংহাসনে বসেন। তিনি পুনরায় রাজধানী ফিরিয়ে আনলেন থিভসে এবং মন্দির-পুরোহিতদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলেন। পুরানো দেবদেবীরা আবার সাড়ম্বরে ফিরে এলেন।

শেষ বিখ্যাত ফ্যারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস্। তিনি পুনরায় প্যালেস্টাইন দখল করেন ও কডেসে মিশরের বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করেন। তাঁর অভিযানের ফলে ইহুদীরা হয় দাস, না হয় দেশত্যাগী হয়ে মিশরে আসতে শুরু করে। তিনিই শেষ ফ্যারাও যিনি মিশরে সুশাসন করে গেছেন।

পুরোহিত শাসন ঃ দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে মন্দিরগুলোর জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায় ও পুরোহিতশ্রেণী খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এর পর থেকে মন্দির ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় রামেসিস্ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে যুদ্ধের ফলে পাওয়া সম্পদ ও পরাজিত রাষ্ট্রের করের বেশির ভাগই মন্দিরে জমা হত। তৃতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে পুরোহিতশ্রেণী সম্পদের চরম অবস্থায় পৌঁছান। এই অবস্থায় ফ্যারাওদের পুরোহিতশ্রেণীর দাসে পরিণত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষায় থাকে। শেষ রামেসিসের রাজত্বকালে এ্যামন মন্দিরের বড় পুরোহিত ক্ষমতা দখল করে নেন। সাম্রাজ্য ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই সময় মিশরের শত্রু ও বিদেশী আক্রমণকারীরা মিশর আক্রমণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সীমান্তে গণ্ডগোল শুরু হল। সীমান্তে এ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন ও পারস্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বিদেশীরা মিশরের বিভিন্ন প্রান্ত দখল করে নিতে আরম্ভ করল। ৩২২ খ্রীঃ পূ গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিশরকে ম্যাসিডনের একটি প্রদেশে পরিণত করলেন। ৩০ খ্রীঃ পূঃ মিশর রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হল।

পারস্যরাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল মেসোপোটেমিয়ার পূর্বদিকে ইরানের মালভূমি। এই মালভূমির মধ্যভাগ ছিল স্বল্প গাছপালা নিয়ে শুষ্কভূমি, আর নিম্নভাগ ছিল বন ও খনিজ পদার্থে ভরা। সব মিলে এই মালভূমিতে শস্য উৎপাদন ও পশুপালন সম্ভব ছিল। ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ এশিয়ার ইরানী জাতি এই মালভূমিতে প্রবেশ করে, যার ফলে স্থানটির নাম হয় ইরান। কিছু এলাকায় তারা স্থানীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয় ও অন্যান্য এলাকায় তাদের সাথে মিলেমিশে বাস করে এক হয়ে যায়।

প্রায় ৯০০ খ্রীঃ পূঃ দুটি বিখ্যাত ইরানী জাতির উদ্ভব হয়—মেডেস ও পারসিয়ান। মেডেসরা, যাদের সম্পর্কে খুব কম জানা যায়, প্রথমে বিখ্যাত হয়। সপ্তম খ্রীঃ পূঃ মিডিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ষষ্ঠ খ্রীঃ পূঃ মেডেসরা পার্শ্ববর্তী পারসিয়ানদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। এই সময় থেকে ইরানে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই সাম্রাজ্য এ্যাকেমিনিড সাম্রাজ্য নাম নিয়ে প্রায় দু' শতাব্দী টিকে ছিল। কাইরাস ছিলেন এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত প্রবাদবাক্যে জড়িয়ে আছে। শোনা যায়, তিনি রাজার ছেলে হয়েও মেষ-পালকের দ্বারা মানুষ হয়েছিলেন। ৫৪৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কাইরাস আর্মেনিয়া ও কাপ্পাডোসিয়া দখল করেন এবং ৫৪৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লিডিয়া জয় করেন। এইভাবে সমুদ্রতীরবর্তী গ্রীক শহরগুলি সমেত প্রায় সমগ্র এশিয়া মাইনর তাঁর অধিকারে আসে। ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ তিনি ব্যাবিলন দখল করেন। ক্রমে প্যালেস্টাইন ও ফোনেসিয়ার ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। পরবর্তী সম্রাট প্রথম দারিয়ুস সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার ঘটান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ দখল করেন। মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলেও সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে। এই সময় ইরানের শিল্প ও স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। দারিয়ুস ও তাঁর বংশধরেরা গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে যান। আলেকজাণ্ডার তৃতীয় দারিয়ুসকে শেষ আঘাত হেনে ইরান দখল করে নেন।

প্রাচীন ইরানে বেশির ভাগ জমির মালিক ছিলেন রাজা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা, রাষ্ট্রের কর্মচারী, পুরোহিতশ্রেণী ও অভিজাতরা। এইসব জমিতে যে কৃষকরা কাজ করত, তাঁরা প্রায় ভূমিদাস ছিল। জমিদাররা দাসদের দিয়েও জমি চাষ করাতেন। কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। উচ্চশ্রেণীর অধিবাসীদের প্রাচুর্য ছিল ও তাঁরা বিলাসের মধ্যে বাস করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে রাজ্যে প্রাচুর্য ছিল। এ্যাকিমিনিড রাজত্বে মুদ্রার প্রচলন ছিল। বড় বড় সড়ক তৈরী হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হয়। জলসেচের জন্য খাল-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় কৃষিকার্যের বিপুল উন্নতি হয়।

ধর্ম ঃ ইরানে বিভিন্ন রকমের ধর্মবিশ্বাস ছিল। মূল ধর্ম ছিল জরথুস্ট্র ধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তন করেন জরথুস্ট্র। তিনি ধর্মে নতুন নীতি আনয়ন করেন। জরথুস্ট্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম-তারিখ-নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায়নি। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, তিনি সপ্তম খ্রীঃপূঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চিন্তা ও শিক্ষা "আভেস্তা-ই-জেদ" নামে ধর্মপুস্তকে গাথা ও সঙ্গীতে লেখা আছে। তিনি বলেছেন, পৃথিবী ভাল ও মন্দ দুই শক্তিতে বিভক্ত। বিশ্বচরাচর ও প্রতিটি জীবন এই ভালো ও মন্দের, আলো ও অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি। আহুর মাজদা বা ভগবান হলেন ভাল; ও আহিরমান হলেন মন্দ। আহুর মাজদা বা ভালোর সঙ্গে আহিরমান বা মন্দের সব সময় যুদ্ধ চলছে। শেষে আহুর মাজদার জয় হবে ও পৃথিবী ন্যায়ের পথে চলবে। মানুষ কিন্তু এই যুদ্ধে নীরব দর্শক নয়। এই যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য তাকে কতকগুলো ভালো গুণের অধিকারী হতে হবে। সূর্য ও অগ্নিকে আহুর মাজদার চিহ্ন হিসেবে পূজো করা হত, কারণ আহুর মাজদা ছিলেন আলোর প্রতিনিধি।

ইহুদীগণ (The Jews)

খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় উর নামক স্থানে 'হিব্রু' বা 'ইহুদী' নামে এক যাযাবর জাতি বাস করত। ভেড়ার

পাল ছিল তাদের সম্পদ—আর এই ভেড়ার পালের জন্য তারা যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াত। ইহুদীদের সম্পর্কে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের প্রথম অংশ "ওল্ড টেস্টামেন্টে" লেখা আছে। তারা নিজেদের আব্রাহামের বংশধর বলে দাবি করত।

যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে তাদের দিন ভালই চলছিল। দীর্ঘদিন উরে কাটানোর পর হঠাৎ সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও ইহুদীরা মিশরে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর হিকক্স নামে বিদেশীরা মিশর আক্রমণ করলে ইহুদীরা হিকক্সদের পক্ষ অবলম্বন করে। হিকক্সরা যতদিন মিশরে ছিল, ততদিন ইহুদীরা শান্তিতেই বসবাস করছিল। কিন্তু, হিকক্সরা মিশর থেকে বিতাড়িত হলেই ইহুদীদের দুর্দিন শুরু হয়। ফ্যারাওরা ইহুদীদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করেন। ইহুদীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট তৈরি, পিরামিড নির্মাণ ও অন্যান্য পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নেওয়া হত। কিন্তু এতেও তারা রেহাই পেল না। তাদের যাতে বংশ না বাড়তে পারে, সেইজন্য ফ্যারাও আদেশ দিলেন, —ইহুদীদের ঘরে পুত্রসন্তান জন্মালেই তাকে মেরে ফেলতে হবে। এই নির্মম আদেশে হাজার হাজার ইহুদী শিশু অকালে প্রাণ হারায়। সেই সময় ইহুদীদের মধ্যে মোজেস্ নামে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। অপমানিত জাতির ব্যথা তাঁর বুকে বাজলো ও তিনি স্বজাতির মুক্তির কথা চিন্তা করলেন। ইহুদীরা প্যালেস্টাইনকে মনে করত ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত নিজেদের দেশ। মোজেস্ স্থির করলেন, ইহুদীদের মিশর থেকে উদ্ধার করে "প্রতিশ্রুত দেশ" প্যালেস্টাইনে নিয়ে যাবেন। ইহুদীদের মিশর ত্যাগের কাহিনীকে 'নিষ্ক্রমণ' বলে।

ইহুদীদের নিষ্ক্রমণ ঃ মোজেসের উপদেশে ইহুদীরা লোহিত সাগরের পথ ধরে প্যালেস্টাইনের দিকে রওনা হল। কিন্তু লোহিত সাগর পার হওয়া, সে যুগে ভীষণ কঠিন ছিল। মিশরের ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিস্ ইহুদীদের পলায়নে বাধা দেওয়ার জন্য অনেক সৈন্য পাঠালেন। ইহুদীরা ভয়ে মোজেসের ওপর বিরক্ত হলেন। মোজেস্ তাদের বললেন, তারা তাদের প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছবেই। ইহুদীদের অতীত ইতিহাসে আছে

লোহিতসাগরের জল শুকিয়ে গিয়ে ইহুদীদের পার হওয়ার রাস্তা হয়ে যায়। ইহুদীরা সহজেই লোহিতসাগর পার হয়ে গেল। মিশরীয়রা যে পথে প্যালেস্টাইন অভিযান করতে যেত মোজেস সেই সিনাই পর্বতের পথ ধরে ইহুদীদের নিয়ে চললেন। বলা হয়, একদিন মোজেস বেরিয়ে সিনাই পাহাড়ের দিকে যান। সঙ্গে নিয়ে গেলেন দু-খানি পাথর। রাত্রিতে ভীষণ ঝড়-বাতাস এল। তিনদিন পরে তিনি ফিরে এলেন।—সঙ্গে সেই দু'খানি পাথর। পাথরের ওপর লেখা আছে মোজেসের প্রতি জিহোবা বা ভগবানের দশটি নির্দেশ। এই দশটি নির্দেশ হল, (১) ঈশ্বর অদ্বিতীয়, (২) মূর্তিপূজা করবে না, (৩) ঈশ্বরের নাম ব্যর্থ হয় না, (৪) সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম করবে, (৫) পিতামাতাকে ভক্তি করবে, (৬) কাউকে হিংসা করবে না, (৭) ব্যাভিচার করবে না, (৮) পরের জিনিস অপহরণ করবে না, (৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, (১০) প্রতিবেশীর জিনিসে লোভ করবে না। বলা হয়, চল্লিশ বছর চলার পর মোজেস্ কান্নান অঞ্চল দখল করেন। বিজয়ী ইহুদীরা প্রচুর লোককে হত্যা করে তাদের প্রতিশ্রুত দেশ অধিকার করল।

প্যালেস্টাইনে এসে ইহুদীরা একটি রাজ্য স্থাপন করে। ইহুদীদের যিনি প্রথম রাজা হন, তাঁর নাম সল বা সাউল। সলের পর ডেভিড রাজা হলেন। ডেভিড শুধু রাজাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি ও গায়ক। তাঁর সময়েই প্যালেস্টাইনের রাজধানী হয় "জেরুজালেম"। "জেরুজালেম" শব্দটির অর্থ হল শান্তির দেশ। ডেভিডের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সলোমন রাজা হন। সলোমন জেরুজালেমে একটি বিরাট মন্দির তৈরি করেন। তাঁর সময়ে প্যালেস্টাইন শান্তি ও সম্পদে পূর্ণ ছিল।

ইহুদীরা চিরদিনই ধর্মপ্রাণ জাতি। কিন্তু তারা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল। তাদের দেবতার নাম জিহোবা। তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। ইহুদী জাতির ইতিহাস ও তাদের ধর্মচিন্তা বাইবেলের "ওল্ড টেস্টামেন্টে" লেখা আছে। ইহুদীদের ভাষার নাম হিব্রু। ইহুদীরা মনে করত, তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি; তাদের সমান কেউ নেই; ঈশ্বরের অনুগ্রহ না পেলে কেউ ইহুদীদের ঘরে জন্মায় না।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ'শো বছর আগে পারস্যের সম্রাট ইহুদীদের দেশ জয় করেন। পারস্যের সম্রাটের অত্যাচারে ইহুদীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রশ্নাবলী

ব্যাবিলন

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) ব্যাবিলনের সভ্যতার কাহিনী লেখ।

(খ) ব্যাবিলনকে ধর্মীয় রাষ্ট্র বলা হয় কেন? ব্যাবিলনীয়দের সমাজে পুরোহিতদের ক্ষমতা বেশী ছিল, না রাজাদের? পুরোহিতদের কি কি কাজ করতে হত?

(গ) ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছেন কে? তাঁর 'আইন-সংগ্রহ' বলতে কি বোঝ?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) ব্যাবিলনের অধিবাসীরা কি কি খেত?

(খ) জমিকে বাড়তি জল থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যাবিলনীয়রা কি করত?

(গ) ব্যাবিলনের সভ্যতা বাণিজ্যিক সভ্যতায় পরিণত হয় কি করে?

(ঘ) ব্যাবিলন রাজ্যে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত কারা? আইনত কারা রাজা ছিলেন?

(ঙ) ব্যাবিলনে কি কি দেবতার পূজা হত? তারা কি করে এক দেবতায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে? তাদের প্রধান দেবতার নাম কি ছিল?

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে মিশর

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে মিশরের অগ্রগতি বর্ণনা কর।

(খ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে মিশরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(গ) মিশরের সর্বশেষ ফ্যারাও কে ছিলেন? তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ
(ক) প্রাচীন মিশরের ইতিহাস কয় ভাগে বিভক্ত? কি কি?
(খ) ফ্যারাও ইখ্‌নাটনের ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ। এই সংস্কারমূলক কাজসমূহ ব্যর্থ হয় কেন? এর ফল কি হয়েছিল?
(গ) ফ্যারাও সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর। এই পতনের জন্য ফ্যারাও ইখ্‌নাটনকে কতখানি দায়ী করা যায়?

ইরান

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ
(ক) প্রাচীন ইরানীদের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(খ) আকিমিনিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ
(ক) প্রাচীন ইরানীরা কয়টি জাতিতে বিভক্ত ছিল ও কি কি? তাদের মধ্যে কোন্ জাতি সাম্রাজ্যবিস্তার করে?
(খ) আকিমিনিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর জীবন সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে লেখ।
(গ) ইরানীদের মূল ধর্ম কি? এই ধর্মমতের প্রবর্তক কে? তাঁর বাণী কি ছিল?

ইহুদীগণ

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ
(ক) ইহুদীরা নিজেদেরকে কার বংশধর বলে মনে করত? তাঁদের সম্বন্ধে কি জান?
(খ) মোজেস্ আনুমানিক কত খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল?
(গ) রাজা সলোমনের আমলে জেরুজালেমের বর্ণনা দাও।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ
(ক) ইহুদীরা কাদের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন দখল করে? কেন তারা প্যালেস্টাইন ত্যাগ করেছিল?
(খ) মিশরে ইহুদীরা সুখে থাকতে পারেনি কেন? ইহুদীদের ধ্বংস করবার জন্য ফ্যারাও কি কি উপায় গ্রহণ করেন?
(গ) মোজেস্ কে ছিলেন? কোন্ পথে মোজেস্ প্যালেস্টাইন যাত্রা করেন? কি কারণে মোজেসের প্রতি ইহুদীদের বিশ্বাস জন্মে?

গ্রীস দেশ হল বলকান উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণ অঞ্চল। গ্রীসের প্রায় সবটাই সাগর দিয়ে ঘেরা। গ্রীসের পূর্বদিকে ইজিয়ান সাগর গ্রীসকে তুরস্ক থেকে পৃথক করেছে। ইজিয়ান সাগরে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। গ্রীস মূলত পর্বতময় দেশ, সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল কম ও জমিও ছিল অনুর্বর। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে দক্ষিণ গ্রীসের লাকোনিয়া ও মেসোনিয়া, মধ্য গ্রীসের বোয়োটিয়া ও উত্তর গ্রীসের থেসালীতে ছিল উর্বর সমতলভূমি, —যেখানে আবাদযোগ্য জমি পাওয়া যেত। অন্যান্য সভ্যতায় যেমন নদীর

ইজিয়ান সাগরে গ্রীক দ্বীপসমূহ

ছিল বিশেষ প্রভাব, গ্রীসের ইতিহাসে নদীর বিশেষ ভূমিকা ছিল না, বরং গ্রীসের জীবনে সমুদ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

গ্রীকরা এসেছিল উত্তরদিকের, সম্ভবত দানিয়ুব নদীর উপত্যকা থেকে। তারা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা বলত। যে ক'টি গোষ্ঠী ইজিয়ান অঞ্চলে এসেছিল। তাদের নিজস্ব নাম ছিল যেমন আচাঈয়নস্, আয়োনিয়ানস্ ও ডোরিয়ানস্। কিছুদিন পরে তারা নিজেদের হেলেনস্ অর্থাৎ গ্রীক বলতে আরম্ভ করে।

ক্রীট দ্বীপের প্রভাব ঃ প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে ক্রীট দ্বীপের প্রভাব

অপরিসীম। গ্রীক সভ্যতা অনেক দিক থেকে ইজিয়ান সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। ইজিয়ান সাগরে ক্রীট, মেলস্ প্রভৃতি দ্বীপে প্রাচীন কালে এক মহান্ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং তার প্রভাবেই পরবর্তী কালে গ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রীটের সভ্যতা ছিল মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার সমসাময়িক—গ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। ক্রীটের অধিবাসীরা বড় বড় দালান, প্রাসাদ নির্মাণ করতে জানত—তারা বড় বড় শহরও তৈরি করেছিল। এইসব শহরে জলসরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত ছিল। মিশরীদের মত তারা নানা রকমের রং-করা পাত্র তৈরি করত। মিশরীদের মত তারা অক্ষর লিখে মনের ভাবও প্রকাশ করতে পারত—তাদের লিপি ছিল চিত্রলিপি। ক্রীটানরা বাণিজ্য ও যুদ্ধের জন্য নৌকো ব্যবহার করত। খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রীকরা এসে ক্রীট দ্বীপ দখল করে নেয়। গ্রীক সভ্যতা নানাভাবে এই ক্রীট দ্বীপের সভ্যতার কাছে ঋণী।

হোমারের যুগঃ গ্রীসের প্রাচীন মহাকবি ছিলেন হোমার। তিনি কখন ও কোথায় জন্মেছিলেন, তা জানা যায় না। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় যে, হোমার খ্রীষ্টজন্মের ন'শ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হোমার আমাদের দেশের "রামায়ণ" ও "মহাভারতের" মত "ইলিয়াড" ও "ওডিসি" নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।

অন্ধ হোমার

গ্রীসের ইতিহাসের প্রাচীন যুগ—'বীরের যুগ' বলে চিহ্নিত। হোমার এই 'বীরের যুগে' জন্মেছিলেন। তাঁর রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'তে

হু'টি সুন্দর কাহিনী আছে—ট্রয়-এর যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে 'ইলিয়াড' রচিত হয় ও 'ওডিসি'তে ওডিসিয়াসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুই মহাকাব্য থেকে সেই যুগের অনেক তথ্য জানতে পারা যায়; যেমন—তখনকার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। গ্রীকরা সেই সময় কৃষিকাজ ও পশুপালন করত। বংশানুক্রমিক ভাবে অভিজাতরা সমাজে প্রধান ভূমিকা পালন করত। রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল গ্রাম। তখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজা সব ক্ষমতার অধিকারী হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিবিশেষের ছিল না; —পরিবারের সবাই ছিল তার মালিক। গ্রীকরা প্রাকৃতিক দেব-দেবীকে তখন পূজো করত।

নগর-রাষ্ট্রের উত্থান ঃ শহর বা নগর-রাষ্ট্র গঠন গ্রীক সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রাচীন কালের গ্রামগুলি একত্র হয়ে এক-একটি নগরে পরিণত হয়। নানা কারণে এই নগরগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রীস ছিল পর্বতময় দেশ—সেইসব পর্বত অতিক্রম করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। ফলে সমগ্র গ্রীসে একটি রাজ্য তৈরি না হয়ে অসংখ্য নগর-রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল। লৌহের আবিষ্কারের ফলে শিল্পের উন্নতি হয় ও কৃষির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নানা জায়গায় এই শিল্পকে ঘিরে অর্থনৈতিক কেন্দ্রের সৃষ্টি হল ও নগর গড়ে উঠল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাণিজ্যকেন্দ্রও নগর-রাষ্ট্রের রূপ নেয়। এইভাবে এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ্‌ ইত্যাদি নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এগুলিকে পোলেইস বা নগর-রাষ্ট্র বলা হত। এই নগর-রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত।

উপনিবেশ স্থাপন ঃ মূল ভূখণ্ডে যখন এই রকম অবস্থা চলছিল, তখন উপনিবেশ স্থাপনের বিশেষ প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সময়কে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনের যুগ বলা হয়। উপনিবেশ স্থাপন বলতে বোঝায় বিদেশী রাষ্ট্রে বসতি স্থাপন। প্রতিটি নগর-রাষ্ট্রই উপনিবেশ স্থাপন করে। কালক্রমে এই উপনিবেশগুলো মাতৃরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বাধীন হয়ে যায়। প্রতিটি উপনিবেশের নিজস্ব আইনকানুন, বিচারালয়, নাগরিকত্ব ও মুদ্রা

ছিল। বিভিন্ন কারণে এই উপনিবেশগুলো স্থাপিত হয়েছিল—প্রথমতঃ, ব্যবসার সুবিধার জন্য উপনিবেশগুলো ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। দ্বিতীয়তঃ, নগর-রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তি জনসংখ্যা অন্যস্থানে বসতি স্থাপন করত; তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলেও উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে খ্রীঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনর, ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে এই উপনিবেশগুলো স্থাপিত হয়েছিল।

স্পার্টা

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে স্পার্টা ছিল স্বতন্ত্র। ভৌগোলিক কারণে বিশেষ করে পাহাড়-পর্বত দ্বারা স্পার্টা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে ছিল। স্পার্টানদের মূল বৃত্তি ছিল যুদ্ধ করা। স্পার্টানদের নানা প্রথা ও আইনকানুন সম্পর্কে আমরা প্রবাদবাক্যের লাইকারগাসের কাছ থেকে জানতে পারি। স্পার্টার মোট জনসংখ্যা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ ও সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল স্পার্টানরা, যারা ছিল ডোরিয়ানদের বংশধর। তারাই ছিল সব জমির মালিক। এই জমি সমভাবে বিভক্ত ছিল। কিন্তু স্পর্টানরা এই সব জমিতে কাজ করত না। জমিতে কাজ করত তৃতীয় শ্রেণীর লোক। স্পার্টানরাই সব রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা ভোগ করত। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল বিদেশীরা। তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকলেও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। এদের বেশির ভাগই ছিল কারিগরী শ্রেণীর। পুরানো অধিবাসীদের বংশধর ও হেলট্‌রা (দাস) ছিল তৃতীয় শ্রেণীর। তারা জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে থাকত ও সেখানেই কাজ করত। তাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। স্পার্টানরা সব সময়েই এদের বিদ্রোহের ভয়ে থাকত ও প্রায়ই শাস্তি দেবার জন্য অভিযান করত।

স্পার্টার রাজাদের বিশেষ কাজই ছিল যুদ্ধ করা। একটি অভিজাত-পরিষদ ও একটি জন-পরিষদ শাসনব্যবস্থা দেখাশোনা, কর্মচারী নির্বাচন ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। স্পার্টার সরকার ছিল শুধু যুদ্ধের জন্য। যাঁরা সামরিক বিভাগে বিশেষ পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরাই জন-পরিষদের সদস্য হতে পারতেন।

স্পার্টার প্রতিদিনের জীবন ও প্রথা চলত শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্যে—সামরিক শিক্ষা। সাত বছর বয়স থেকেই শিশুকে সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হত সাহস ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা ও শরীর গঠনের জন্য। কুড়ি বছর বয়স থেকে প্রতিটি যুবক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হত। সে থাকত সামরিক ছাউনিতে, খেত সবার সঙ্গে ও নিয়মিত শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা লাভ করত। শিশু বয়স থেকে ষাট বছর পর্যন্ত প্রতিটি স্পার্টানকে সামরিক ছাউনিতে থাকতে হত। এইসব প্রথা ও নিয়মের ফলে স্পার্টা একটি বিখ্যাত সেনাবাহিনী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সেনাবাহিনী অনেকদিন পর্যন্ত অপরাজেয় বলে পরিচিত ছিল। স্পার্টানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদেশ-ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। তাদের ধারণা ছিল, নতুন ভাবনা-চিন্তা তাদের ব্যবসা নষ্ট করে দেবে। স্পার্টানরা ভাল সৈনিক ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রীক সংস্কৃতিতে তাদের দান বিশেষ কিছু ছিল না।

এথেন্স

এথেন্স শহর গড়ে উঠেছিল পর্বতময় অনুর্বর মধ্য গ্রীসের এ্যাটিকা অঞ্চলে। এথেন্সে জমি অনুর্বর থাকায় কৃষিকাজ খুব কষ্টসাধ্য ছিল। প্রধান কৃষিজাত জিনিস ছিল ফল, সবজি, জলপাই ও আঙ্গুর। খাদ্যশস্য বেশি না হওয়ায় বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। এথেন্সের নিকটে সমুদ্র থাকায় এথেন্সবাসীরা সমুদ্র অভিযানে ও ব্যবসায়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

এথেন্স নগর-রাষ্ট্র স্পার্টা থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ ছাড়া আর কিছু জানা যায় না। এথেন্সের শাসনাধীন অঞ্চল ধীরে ধীরে ও শান্তিপূর্ণভাবে অধিকৃত হয়েছিল। ফলে এথেন্সের জঙ্গী ভাব ছিল না। গ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে এথেন্সের সরকার রাজতন্ত্র থেকে অভিজাততন্ত্রে (Oligarchy) পরিণত হয়। রাজ্যের শাসনভার কয়েকটি অভিজাত পরিবারের হাতে চলে যায়। দেশের বেশির ভাগ উর্বর জমি অভিজাতদের হাতে চলে আসে। কৃষকরা তাদের জমি অভিজাতদের কাছে বন্ধক দিয়ে দাসশ্রেণীতে পরিণত হয়। অভিজাত ও দাস ছাড়াও এথেন্সে স্বাধীন কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, শিল্পীরা "ডেমস" নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ধনী ছিলেন। ৫৪৯ গ্রীঃ পূঃ এই শ্রেণীর নাগরিকদের বিদ্রোহের ফলে সোলন নামে একজন শাসক হন। সোলন কতকগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার করলেন। তিনি সমস্ত বন্ধক তুলে দিয়ে ঋণের জন্য যাঁরা দাস হয়েছিলেন, তাঁদের মুক্তি দিলেন। ঋণের জন্য যে দাস-প্রথা, তা উঠিয়ে দেওয়া হল। তবে অন্যদেশ থেকে আনা দাসরা কিন্তু মুক্তি পেল না। প্রতিটি নাগরিক নিয়ে গঠিত জন-পরিষদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। একটি শাসন-পরিষদও গঠিত হল। এইসব সংস্কারের ফলে গরীব ও মধ্যবিত্তরা লাভবান হল। দেশের বিচারব্যবস্থারও সংস্কার করা হয়। স্থির হয়, বিচারকরা নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সোলন এথেন্সে স্থায়িভাবে বসবাসকারী কারিগরদের নাগরিকত্ব দেন।

এথেন্সের গণতন্ত্রের আরও উন্নতি হয় ক্লাইসথেনিসের আমলে (৫১০ গ্রীঃ পূঃ—৫০৫ গ্রীঃ পূঃ)। তিনি অভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটান। সমস্ত রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্রের শাসন ও সামরিক বিভাগের পদগুলো এই ভাগ অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা হল। এর ফলে বংশানুক্রমিক অভিজাতদের ক্ষমতা আরও কমে যায়।

এথেন্সে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ হয় পেরিক্লিসের সময় (গ্রীঃ পূঃ ৪৬৯—৪২৯ গ্রীঃ পূঃ)। জন-পরিষদ এখন আইন তৈরি ও শাসন-পরিষদের তৈরি আইন নাকচ করতে পারে। জন-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত দশজন

সেনাধ্যক্ষ দেশ শাসন করতেন। পেরিক্লিস পনেরো বছর এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন। সেনাধ্যক্ষরা জন-পরিষদের কাছে দায়িত্বশীল ছিলেন। সুতরাং, তাঁরা একনায়ক হতে পারতেন না। দেশে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত অনেক বিচারালয় ছিল। সেইসব বিচারালয়ে জুরির সাহায্যে বিচার করা হত। জুরিরা সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন।

এথেন্স ও স্পার্টার লড়াই ঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স গণতন্ত্র দুটি বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের ফলে এথেন্স গণতন্ত্রের মহিমা শেষ হয়ে যায়। প্রথম যুদ্ধ হয় শক্তিশালী পারস্য-সম্রাট দারিয়ুসের সঙ্গে। তিনি ইতিমধ্যে সিন্ধুনদ থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত দখল করে, ইজিয়ান সাগর অতিক্রম করে গ্রীসজয়ের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে এথেন্সের কাছে ম্যারাথনে এসে উপস্থিত হয়। এই বিপদের সময় সর্বপ্রথম গ্রীক রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হল। গ্রীক সেনাবাহিনী সংখ্যায় কম হলেও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ৪৯০ খ্রীঃ পূঃ ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়লাভ করে ও ইরানী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দেয়। গ্রীকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ইরানী সেনাবাহিনী দশ বছর পর পুনরায় গ্রীসে আসে। এইবার তারা থার্মোপাইলি নামক স্থানে স্পার্টানদের মুখোমুখি হয়। ইরানী সেনাবাহিনী এথেন্স শহর পুড়িয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত হটে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে গ্রীসে এথেন্সের প্রাধান্য বাড়িয়ে দেয়।

এর পরই শুরু হয় এথেন্স ও স্পার্টার মর্যাদার লড়াই। এই লড়াই বা যুদ্ধ ৪৩১ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৪০৪ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত চলে। ইতিহাসে এই বিখ্যাত যুদ্ধ পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইরানীয় সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এথেন্স অনেক গ্রীস-রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। এই চুক্তির ফলে তৈরি হল ডেলস্-এর লীগ বা ডেলিয়ান-সংঘ। এই সংঘের কোষাগার ছিল ডেলস্ দ্বীপের এ্যাপোলোর মন্দির। ক্রমে স্বার্থের জন্য এথেন্স এই চুক্তিকে একটি বড় নৌ-সাম্রাজ্যে পরিণত করে। স্পার্টা এথেন্সের এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ল। বহুদিন থেকে এথেন্স ও স্পার্টার

মধ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির জন্য বিরোধ ছিল। এই সময় বেশির ভাগ গ্রীক রাষ্ট্রই দুটি দেশের কোনও একটি পক্ষে যোগ দেয়। এই দীর্ঘ যুদ্ধে এথেন্স পরাজিত হয় ও তার গণতন্ত্র ভেঙ্গে যায়। এথেন্স স্পার্টার অধীনস্থ হয়ে যায়। পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধ গ্রীসের গৌরবময় যুগের অবসান ঘটায়। যুদ্ধের পরবর্তিকালে গ্রীক রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের পতনের দিকে নিয়ে যায়।

গ্রীক সভ্যতায় এথেন্সের দান : গ্রীক সভ্যতায় এথেন্সের দান অসীম। সোলনের আমলে এথেন্সের নব জাগরণের শুরু হয় ও এথেন্সের মহান্ শাসক পেরিক্লিসের আমলে সেই জাগরণ চরম পরিণতি লাভ করে। পেরিক্লিসের সময় গ্রীসের কয়েকটি শহর-রাষ্ট্র এথেন্সের অধীনতা স্বীকার করার ফলে এথেন্স একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পেরিক্লিসের সময় সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে এথেন্স পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পেরিক্লিস

সাহিত্যে এথেন্সের দান অসামান্য। গ্রীক সাহিত্য বিশেষ করে নাটকের এই সময় চরম বিকাশ ঘটে। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে এস্‌কাইলাস, ইউরিপিডিস, সফোক্লিস ও এ্যারিস্টোফিনিস সবচেয়ে বিখ্যাত। এস্‌কাইলাস ছিলেন গ্রীক বিয়োগান্তক নাটকের প্রতিষ্ঠাতা। সফোক্লিসকে বলা হয় সবথেকে বড় বিয়োগান্তক নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটক "রাজা ওয়াদিপাস", "এ্যান্তিগোনে", "ইলেক্‌ট্রা" আজও পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। ইউরিপিডিস তাঁর নাটকে যুদ্ধকে বর্জন করেছেন ও দাস এবং সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এ্যারিস্টোফিনিস নতুন ধরনের মিলনান্তক নাটক রচনা করেছেন।

পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস লেখক হেরোডোটাস এই যুগের মানুষ। হেরোডোটাসকে "ইতিহাসের জনক" বলা হয়। ইনি গ্রীসের নানা স্থান ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম গ্রীসের ইতিহাস রচনা করেন। এই যুগের আর একজন বিখ্যাত ইতিহাস লেখকের নাম থুকিডাইডিস। স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধে তিনি এথেন্সের সেনানায়ক হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর রচিত "পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধ" বিখ্যাত ইতিহাস-পুস্তক হিসেবে আজও সমাদৃত।

হেরোডোটাস

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটল এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিস ছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক। তিনি যুক্তি দিয়ে সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলি খণ্ডন করতেন। শিষ্যদের সঙ্গে নানা বিষয়ে যা আলোচনা করতেন তা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তাঁর মনীষায় মুগ্ধ হয়ে এথেন্সের তরুণরা তাঁর শিষ্য হতে থাকে। প্রাচীনপন্থীরা তাঁর উপর রেগে যান। তাঁরা অভিযোগ করেন, সক্রেটিস দেশের যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, তাঁর বিচার হয়; এবং অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে, বিষ খেয়ে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।
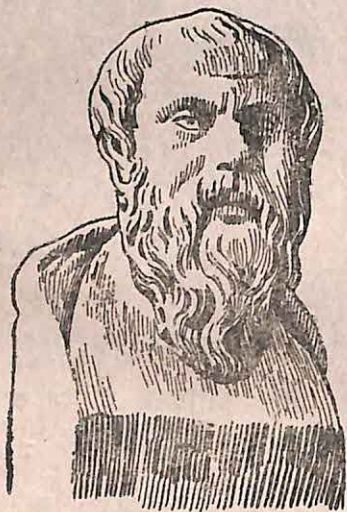
সক্রেটিস

সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য ছিলেন প্লেটো। তিনি ছিলেন দার্শনিক। এথেন্সে তিনি "একাডেমি" নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। তাঁর রচিত "রিপাবলিক" পুস্তকটি বিখ্যাত। এ্যারিস্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য। তিনি ন্যায়, নীতি, ধর্ম, জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করে গেছেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এথেন্স উন্নতি লাভ করেছিল। গ্রীক শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায় গ্রীক মন্দিরসমূহে। পেরিক্লিসের সময়ে

পার্থেনন-এর মন্দির

যে মন্দিরগুলো তৈরি হয়, তার মধ্যে পার্থেনন-এর মন্দির সবচেয়ে বিখ্যাত।

এ্যাপোলো

জিউস

স্থাপত্যে গ্রীকরা মনুষ্যদেহের সাহস ও সৌন্দর্য প্রকাশে পারদর্শী ছিল। দেবতার যেসব মূর্তি তাঁরা তৈরি করতেন, তা ছিল মানুষের আকারে। মাইরন ও ফিডিয়াস ছিলেন গ্রীসের বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্পী। ফিডিয়াসকে পেরিক্লিস এথেন্সে মন্দির তৈরির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যান্য ভাস্করের মধ্যে প্রক্সিটেলিসের নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রীকরা প্রকৃতির নানা শক্তিকে দেবদেবী মনে করে পূজো করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, দেবতারা অলিম্পাস পর্বতে বাস করেন। জিউস ছিলেন দেবরাজ, তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের অধীশ্বর। এ্যাপোলো ছিলেন সূর্যদেব। জ্ঞানদায়িনী দেবতার নাম ছিল এথেনা। তাঁর নাম থেকে এথেন্স নামের উৎপত্তি।

ম্যাসিডন ঃ এথেন্স ও স্পার্টা যখন পরস্পরের যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ম্যাসিডন নামে একটি অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র গ্রীকরাষ্ট্র সমগ্র গ্রীসে প্রাধান্য লাভ করল। ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে সমগ্র গ্রীসকে পদানত করেন।

ফিলিপের পর তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হন। উপযুক্ত শিক্ষার গুণে আলেকজাণ্ডার উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন ও মনে মনে তিনি পৃথিবীজয়ের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসতে না বসতেই গ্রীসের ছোট ছোট রাজ্যগুলো বিদ্রোহ শুরু করল। আলেকজাণ্ডার খুব কঠিন হাতে থেস ও থিবস্ রাজ্য দুটিকে একেবারে ধ্বংস করে ফেললেন ; ফলে, অন্যান্য রাজ্য ভয়ে চুপ করে গেল। এরপর তিনি এশিয়া-বিজয় অভিযান শুরু করলেন (৩৩৬ খ্রীঃ পূঃ)। বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডার দার্দানেলিস

আলেকজাণ্ডার

পারস্য দখল করেন। এর ফলে তাঁর রাজ্যসীমা ভারতবর্ষের সীমানা স্পর্শ করল। তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অনেকগুলো রাজ্য ছিল। সীমান্ত অঞ্চল দখল করে আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলায় উপস্থিত হলে রাজা অম্ভি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। তক্ষশিলার পূর্বে ঝিলাম ও চিনাব নদীর মাঝে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন পুরু। পুরু আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় ও পুরু পরাজিত হন। বন্দী পুরুকে আলেকজাণ্ডারের সামনে আনা হলে পুরুর নির্ভীক জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এরপর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। পথে কয়েক জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে তিনি ব্যাবিলনে পৌঁছলেন। ব্যাবিলনে ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ মাত্র ৩২ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার মারা যান।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিরা সাম্রাজ্য ভাগ করে নেন। সেনাপতি সেলুকাস পান পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, ও সেনাপতি টলেমি পান মিশর, প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে গ্রীক রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য পূর্বদিকে অভিযান শুরু করে। খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ থেকে ৩০ খ্রীঃ পূঃ-এর মধ্যে রোমান আক্রমণের ফলে প্রায় সমগ্র গ্রীস রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্নাবলী
গ্রীস

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) গ্রীসের ইতিহাসে হোমারের যুগ কোন্ সময়কে বলে? কেন বলে? সেই যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) নগর রাষ্ট্র বলতে কি বোঝ? প্রাচীন গ্রীসের সমাজে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কি করে? কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের নাম কর।

(গ) উপনিবেশ বলতে কি বোঝ? কি কি কারণে উপনিবেশগুলির সৃষ্টি হয়েছিল এদের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

(ঘ) গ্রীসের জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, দার্শনিক, ভাস্কর ও ঐতিহাসিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) গ্রীসের কোন্ কোন্ অঞ্চলে আবাদযোগ্য জমি দেখতে পাওয়া যায় ?

(খ) গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যে এত প্রসার ঘটে কেন ?

(গ) ক্রীটান কারা ? তাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ঘ) প্রাচীন গ্রীকদের সামাজিক ব্যবস্থা কি রকম ছিল ?

(ঙ) গ্রীকদের মূল বৃত্তি ছিল কি কি ?

(চ) প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ। তাদের কয়েকজন দেবতার নাম কর।

স্পার্টা

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) কি কি কারণে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে স্পার্টা স্বতন্ত্র ছিল ? তাদের মূল বৃত্তি কি ছিল ? তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) কত বছর বয়স থেকে প্রতিটি যুবককে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হত ? কিভাবে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হত ? কত বছর পর্যন্ত তারা সামরিক ছাউনিতে থাকত ?

(খ) গ্রীসের এমন একটি জাতির নাম কর যাদের বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল এবং কেন ?

(গ) 'স্পার্টানরা' ভাল সৈন্য ছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রীক সংস্কৃতিতে তাদের দান বিশেষ কিছু ছিল না, —এই কথার অর্থ কি ?

(ঘ) এথেন্সে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ? সেই শাসনব্যবস্থার চরম বিকাশ হয় কার সময় ? তাঁর শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(ঙ) স্পার্টার শাসকশ্রেণী একনায়ক হতে পারত না কেন ?

(চ) পেরিক্লিসের সময় স্পার্টার বিচার-ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

এথেন্স ও স্পার্টার লড়াই

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স কোন্ কোন্ দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং কেন ?

(খ) এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল কেন এবং কত খ্রীঃ পূঃ অব্দে ? এই যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল এবং ফল কি হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) এথেনীয়দের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ কাদের হয়েছিল ? কোথায় এবং কে পরাজিত হয়েছিল ?

(খ) থার্মোপাইলির যুদ্ধ কার সঙ্গে হয় ? কারা পরাজিত হয় ?

এথেন্সের সাংস্কৃতিক অবদান

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) গ্রীক সভ্যতায় এথেন্সের অবদান বর্ণনা কর।

(খ) মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে হেরোডোটাস ও থিউসিডাইডিসের অবদান আলোচনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) 'ইতিহাসের জনক' কাকে বলা হয় ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) সক্রেটিস কে ছিলেন ? তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা কি ছিল ? তাঁকে কেন মৃত্যুবরণ করতে হয় ?

(গ) প্লেটো কে ছিলেন ? তাঁর রচিত বই-এর নাম কি ? এই বই-এ তিনি কোন্ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন ?

(ঘ) এথেন্সে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে যা জান লিখ।

ম্যাসিডন

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) আলেকজাণ্ডার কোথাকার রাজা ছিলেন ? তিনি মনে মনে কি স্বপ্ন দেখতেন ? তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) কোন্ পথে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং কোন্ কোন্ জায়গা অধিকার করেন ?

(খ) পুরু কোথাকার রাজা ছিলেন ? আলেকজাণ্ডার তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন কেন ?

(গ) আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য কি হয় ? কি করে গ্রীক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় ?

রোম (Rome)

রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল ইটালী। ইটালীর উত্তরদিকে আছে
আল্পস্ পর্বতমালা ও দক্ষিণ দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। ইটালীর আদি
অধিবাসীরা এসেছিল উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ফ্রান্স থেকে। ২০০০ খ্রীঃ
পূর্বাব্দের পর আল্পস্ পর্বত পার হয়ে ইন্দো-ইউরোপীয়ানরা ইটালীতে
আসতে শুরু করে। বর্তমান ইটালীর অধিবাসীরা এদের বংশধর। ষষ্ঠ
খ্রীঃ পূঃ থেকে রোমান সভ্যতার বিকাশ শুরু হয় ও গ্রীক সভ্যতার পতনের
পর এই বিকাশ চরম পর্যায়ে পৌছায়।

রোম শহরের পত্তন ঃ প্রায় ১০০০ খ্রীঃ পূঃ রোম শহর প্রতিষ্ঠিত হয়
টাইবার নদীর দক্ষিণে লাটিয়াম জেলায়। প্রাচীন রোমের ভাষা ছিল
লাতিন—এই নাম লাটিয়াম থেকে পাওয়া। কথিত আছে, রোমাস ও
রামিউলাস নামে দুই ভাই টাইবার নদীর তীরে রোম শহর প্রতিষ্ঠা
করেন। এঁদের সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে। এই দুই ভাইয়ের জন্ম
হয় রিয়া নাম্নী এক রাজকন্যার গর্ভে। তারা যখন খুব ছোট, তাদের এক
দুষ্টপ্রকৃতির ঠাকুর্দা দুই ভাইকে একটি ঝুড়িতে বসিয়ে টাইবার নদীর জলে
ভাসিয়ে দেয়। ঝুড়িটি জলে ভাসতে ভাসতে টাইবার নদীর তীরে এসে
থামল। নদীর জলে জলপান করতে এসেছিল একটি নেকড়ে বাঘ।
ছেলে দুটিকে সেই নেকড়ে বাঘ দুধ খাইয়ে বাঁচাল। বাঘটি শিকারে গেলে
একজন মেষপালক ছেলে দু'টিকে নিয়ে গেল ; —তাদের নাম দিল রোমাস
আর রোমিউলাস। তাঁরা বড় হয়ে বীর হলেন। রোমাস টাইবার নদীর
তীরে নগর তৈরি করে নাম দিল রোম। রোম নগর সাতটি পাহাড় দিয়ে
ঘেরা, ইটালীর মাঝখানে, সমুদ্র থেকে দূরে নয়। রোমিউলাস রোমের
প্রথম রাজা।

প্রাচীন রোমে ছিল রাজতন্ত্র। রাজা একটি জন-পরিষদ ও সেনেটের
সাহায্যে শাসন করতেন। যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের সব পুরুষ
নাগরিকই জন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। গোষ্ঠীপতিরা ছিলেন সেনেটের
সদস্য ও সেনেট ছিল খুব ক্ষমতাশালী।

কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ : রোম যখন ইটালীতে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, তখন উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির একটি শাখা রাজত্ব করত। তাদের রাজধানী ছিল কার্থেজ নগরে। কার্থেজ সেই সময় বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করে সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। কার্থেজবাসীরা মিশর, গ্রীস, স্পেন ও ভূমধ্যসাগরীয় রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। তাঁরা ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপ জয় করে ও ইটালীর ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিসিলি নামক দ্বীপটির বড় অংশ নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। এই সিসিলিকে কেন্দ্র করেই কার্থেজ ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

ভূমধ্যসাগরের দুই তীরে রোম ও কার্থেজ দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, প্রত্যেকেই নিজের প্রাধান্য রক্ষায় তৎপর। সেইজন্য দুটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। এই যুদ্ধই ইতিহাসে পিউনিক-যুদ্ধ নামে পরিচিত (২৬৪ খ্রীঃ পূঃ—১৪৬ খ্রীঃ পূঃ)। প্রথম যুদ্ধ হয় সিসিলিকে কেন্দ্র করে। এই যুদ্ধে কার্থেজের নেতৃত্ব দেন হ্যামিলকার বার্কা। যুদ্ধে কার্থেজ পরাজিত হয়ে সিসিলি সমেত অনেকখানি এলাকা রোমের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এর কুড়ি বছর পরে শুরু হয় দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন অসামান্য বীর হ্যানিবল। রোমের সেনাপতিদের মধ্যে কেউ-ই হ্যানিবলের সমকক্ষ ছিলেন না। বারবার পরাজিত হয়ে রোমানরা হ্যানিবলের যুদ্ধ-পদ্ধতি আয়ত্ত করে ফেলল। রোমান সেনাপতি কার্থেজ আক্রমণ করলে হ্যানিবল দেশরক্ষার জন্য আফ্রিকায় ছুটে গেলেন। কিন্তু "জামার" যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। তৃতীয় পিউনিক-যুদ্ধ হয় এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে। হ্যানিবলের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছরের মধ্যে আবার কার্থেজ নতুন করে জীবন আরম্ভ করল।

হ্যানিবল

কার্থেজের বাণিজ্যতরীতে ভূমধ্যসাগর ছেয়ে গেল। একদল রোমান কার্থেজের বাণিজ্যবিস্তার দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল। তারা কার্থেজের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করল। এই দলের নেতা ছিলেন কন্‌সাল কেটো। তিনি ছিলেন সুবক্তা। তাঁর সব বক্তৃতার শেষ কথা ছিল—"কার্থেজ ধ্বংস হোক।"

কোটার দলের কার্থেজের কাছে প্রস্তাব পাঠাল কার্থেজকে অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে ও কার্থেজ নগর ভেঙ্গে দশ মাইল দূরে নতুন নগর তৈরি করতে হবে। এই প্রস্তাব কার্থেজ অগ্রাহ্য করায় তৃতীয় পিউনিক-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কার্থেজবাসীরা প্রায় দু'বছর রোমান সৈন্যদের নগরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। তারা জলপথে কার্থেজবাসীদের খাদ্য-চলাচল বন্ধ করে দিল। ফলে কার্থেজবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। রোমানরা কার্থেজ নগর ও শস্যভাণ্ডারে আগুন লাগিয়ে দিল। প্রায় ৫০,০০০ যুদ্ধবন্দী নিয়ে রোমান সৈন্য দেশে ফিরে গেল। এরপর গ্রীক রাষ্ট্রগুলি একের পর এক রোম সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

প্রাচীন রোমের সমাজ: রোমান সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান। অভিজাত ও জমিদাররা ছিলেন প্যাট্রিশিয়ান। এঁরাই সেনেট নামক সভাকে নিয়ন্ত্রণ করত। শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট চাষী, কারিগর ও সৈনিক শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন প্লেবিয়ান। প্লেবিয়ানদের অধিকার খুব অল্পই ছিল। বেশির ভাগ কর তাদের কাছ থেকে আদায় করা হত। বিভিন্ন কারণে তাঁদের নানারকম শাস্তি ভোগ করতে হত। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে প্লেবিয়ানরা বিদ্রোহ করেন। বাধ্য হয়ে প্যাট্রিশিয়ানরা প্লেবিয়ানদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেন। প্লেবিয়ানদের ট্রিবিউনের সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এই ট্রিবিউন কন্‌সালদের ও সেনেটের প্লেবিয়ান সংক্রান্ত আইনসমূহ নাকচ করতে পারত।

রোমের আইনসমূহ বিধিবদ্ধ করায় ৪৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে প্লেবিয়ানদের আর একটি বড় জয় হল। আইনগুলো কয়েকটি কাঠের ফলকে লিপিবদ্ধ করা হয়। আইনগুলো লিপিবদ্ধ করায় জনসাধারণ তাঁদের আইনগত অধিকারগুলো জানতে পারল। তাঁরা কর্মচারীদের আইন ভাঙ্গার চেষ্টাকে বাধা দিতে সক্ষম হল। পরবর্তিকালে প্লেবিয়ানরা ম্যাজিস্ট্রেট, এমন কি

কন্সাল পর্যন্ত নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পান। প্যাট্রিশিয়ানদের অধিকার খর্ব করার জন্য আরও বহুবিধ সংস্কার হল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্লেবিয়ানদের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হল না।

রোমের নাগরিকত্ব ঃ রোমের 'সিভিটাস' বা নাগরিকত্ব লাভ রোমানদের কাছে একটি বিশিষ্ট ঘটনা ছিল। এই নাগরিকত্ব বলতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বোঝাত। সম্পত্তি কেনা ও বিক্রির অধিকার, পিতার সম্পত্তির ওপর পুত্রের অধিকার, সম্পত্তি ভোগ করা, শরীর ও প্রাণের নিরাপত্তা ইত্যাদি ছিল সামাজিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার ছিল নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার, আইন-তৈরিতে অংশগ্রহণের অধিকার, সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করার অধিকার। রোমের নাগরিকের অধিকার-লাভ খুবই সম্মানজনক ছিল। এই অধিকার লাভ করতে হলে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হত;—যে-সে এই অধিকার পেত না। রোমের রাজ্য ইটালীতে বিস্তার লাভ করলে ইটালীর অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের রোমান নাগরিকত্ব দেওয়া হত। ক্রমে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মান দেখানো হত।

দাস-প্রথা ও দাস-বিদ্রোহ ঃ কার্থেজ ও অন্যান্য যুদ্ধে জয়ী হয়ে রোমানরা বহু যুদ্ধবন্দী ধরে আনে। বিজিত দেশ থেকে রোমানরা যুদ্ধ-বন্দীদের দাস হিসেবে দেশে চালান দেয়। দাসদের এক অংশ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে থাকে। তাদের খনিতে, বাড়ী তৈরির কাজে, মন্দির ও রাস্তাঘাট তৈরির কাজে নিয়োগ করা হয়। অপর অংশ নীলামে বাজারে বিক্রি করা হয়। ধনী ব্যক্তিরা দাস কিনে চাষের কাজে, ব্যবসাতে ও বাড়ীর কাজে লাগান। এই সময় থেকে রোমের সমাজ দাস ও দাস-মালিক সমাজে পরিণত হল। দাসদের ওপর নির্ভর করে নানা উৎপাদনের কাজ চলতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে সারা ইটালীতে দাস-শ্রমের নিয়োগ ব্যাপক হারে চলতে থাকে। দাসদের খাটানো হত মূলতঃ জমি ও খনিতে। দাসদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত।

দাস-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পর রোমে বড় বড় কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এদের বলা হত লাটিফানডিয়া। দাসদেরই শুধু এইসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

করা হত। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। বড়লোকদের কাছে কৃষকরা জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অভিজাত ও জমিদারেরা ছোট ছোট দান ও সাহায্য দিয়ে এদের হাতে রাখতে চেষ্টা করতেন। এই সময় ধনী ও অভিজাতরা জঘন্য উপায়ে একে অপরের সঙ্গে বিলাস ও সম্পদের প্রতিযোগিতা করতেন। এর ফলে রোমান সমাজে নৈতিকতার অধঃপতন শুরু হয়।

সার্কাসে দাস ও হিংস্র পশুর খেলা দেখানো খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল। এইরকম যোদ্ধা-দাসকে "গ্লেডিয়েটর" বলা হত। খেলায় হয় পশু, নয়ত দাস প্রাণ হারাত।

বেকার কৃষকদের শান্ত করতে পারলেও, দাস-মালিকরা দাসদের দাবিয়ে রাখতে পারেননি। সশস্ত্র পাহারায় রাখা, শিকল পরিয়ে কয়েদখানায় আটকে রাখা,—ইত্যাদি কোন কিছুতেই দাসদের ঠেকানো সম্ভব হয়নি। নির্মম শোষণের ফলে তাদের সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই দাস-বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু, দাস-মালিকরা সহজেই তা দমন করে। ১৪০ খ্রীঃ-পূর্বাব্দে দাস-বিদ্রোহ ব্যাপক ও ভীষণ আকার ধারণ করে। এশিয়া মাইনর, সিসিলি ও সর্বত্র রোমান শাসকদের দাসদের এই বিদ্রোহ দমন করতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। সিসিলিতে বিদ্রোহ আট বছর চলে। এইসব বিরামহীন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হয়।

রোমান দাস

৭৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে স্পার্টাকাস্ নামে একজন দাস গ্লেডিয়েটর দাসদের একত্রিত করেন। স্পার্টাকাস্ ইটালীর কেপুয়ার সহ-গ্লেডিয়েটরদের বোঝালেন যে, পশুর মত প্রাণ দেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়া শ্রেয়ঃ। প্রথমে সত্তর জন তাঁর দলে যোগ দেয় ও ক্রমে আরও পলাতক দাস এসে সম্মিলিত হয়। তারা ভিস্যুভিয়াস পর্বতে পালিয়ে যায়। রোমান সেনারা তাদের ধরার জন্য অগ্রসর হলে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এই সেনাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে স্পার্টাকাস্ তাঁর দাস-সৈন্যদের সজ্জিত করেন। ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাসরা পালিয়ে এসে বিদ্রোহী দলে যোগ দিতে থাকে। স্পার্টাকাস্ সত্তর হাজার দাসের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কেম্পাগনিয়া ও এপুলিয়া দখল করে দক্ষিণ ইটালীতে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

রোমানরা তিনবার স্পার্টাকাস্দের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান, কিন্তু প্রতিবারই তারা পরাজিত হয়। রোমে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দাসদের দুর্ভাগ্য, এই সংকটের সময় তারা একতাবদ্ধ হতে পারেনি। দাসরা ছিল দেশবিদেশের লোক। রোমানদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্পার্টাকাস্ বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের ছেড়ে দিলে অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে স্বাধীনতার কাছাকাছি এসেও দাসরা ব্যর্থ হয়।

জুলিয়াস সীজার ও রোমান সাধারণতন্ত্রের অবসান ঃ ইটালীতে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সেনাপতিদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। জন-পরিষদের ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যেতে থাকে ও সেনাবাহিনীর নেতারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। দাস-বিদ্রোহ দমনের পর দুই সেনাপতি জুলিয়াস সীজার ও পম্পের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পম্পে তাঁর শত্রুদের দ্বারা মিশরে নিহত হন। সীজার মিশরের রানী ক্লিয়োপেট্রার রূপে আকৃষ্ট হয়ে কিছুদিন মিশরে কাটান। ৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি রোমে ফিরে এসে নিজেকে একচ্ছত্র অধিপতিতে রূপান্তরিত করেন। জুলিয়াস সীজার ছিলেন একদিকে দিগ্বিজয়ী বীর, অন্যদিকে জ্ঞানী ও দয়ালু। তিনি রোমের শাসনক্ষেত্রে অনেকগুলো

নতুন সংস্কার করলেন। কিন্তু, তাঁর অবাধ ক্ষমতা অনেকের ঈর্ষার কারণ হল। সীজার রাজদণ্ড ও সিংহাসন ব্যবহার করতেন বলে অনেকে বলতে লাগলেন সীজার সম্রাট হতে চান। সীজারের প্রিয় বন্ধু ব্রুটাসও একই অভিযোগ তুললেন। শেষ পর্যন্ত ব্রুটাসের ষড়যন্ত্রে সীজার সেনেটের মধ্যেই নিহত হলেন (৪৪ খ্রীঃ পূঃ)।
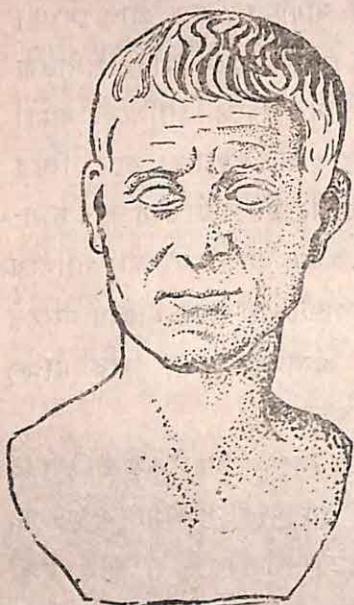
জুলিয়াস সীজার

রোমান সাম্রাজ্য ঃ সীজার নিহত হওয়ার পর ক্ষমতা চলে আসে সীজারের বন্ধু মার্ক এ্যান্টনি, লেপিডাস ও সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টোভিয়ানের হাতে। সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ব্রুটাস ও কেসাস পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু তাঁরা পরাজিত ও নিহত হলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৩৭ সনে অক্টোভিয়ান রোমান সাম্রাজ্যে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তিনি 'অগস্টাস' উপাধি নিয়ে চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি নিজেকে প্রিন্সেপ বা রাজ্যের প্রথম নাগরিক বলতেন। তাঁর সময়ে রাজ্যে বহু প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়। বিজিত অঞ্চলসমূহে তিনি শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন এবং লুঠপাট ও দুর্নীতি দূর করে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি নতুন নতুন বিচারালয় ও ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনকাল ও পরবর্তী কিছু সময় রোম রাজত্বে শান্তি ছিল। সেইজন্য ঐ সময়কে "প্যাক্স রোমানা" বা "রোমান শান্তি" বলা হয়। তাঁর আমল থেকে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা বংশানুক্রমিক হয়ে যায়।

অগস্টাসের যুগকে রোমান সাহিত্যে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। বিখ্যাত কবি ভার্জিল তাঁর আমলে বিখ্যাত সাহিত্য "ইনিড" রচনা করেন। এই যুগের আর একজন বিখ্যাত কবি হলেন হোরাস। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিভি ও বড় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী প্লিনি এই সময়ে তাঁদের পুস্তক রচনা করেন। অগস্টাসের আমলে স্থাপত্য ও শিল্পেরও বিকাশ হয়।

প্রথম খ্রীষ্টাব্দে জুলিও-ক্লডিয়ান বংশের বংশধরেরা রোমে শাসন করেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন নীরো। নীরো ছিলেন বিকৃত-চরিত্র, খামখেয়ালী শাসক। কথিত আছে, তাঁর রাজত্বকালে রোমে একবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। রোম যখন আগুনে পুড়ছে, নীরো নাকি আনন্দে বীণা বাজাচ্ছিলেন। এর পর ভেস্‌পাসিয়ান নীরোকে পদচ্যুত করে ফ্লভিয়ান বংশের শাসন পত্তন করেন। এই সময় থেকে সম্রাটরা ক্রমাগত প্রাদেশিক সামন্তদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য শাসন করেন এন্টোনাইন বংশ। এই বংশের বিখ্যাত শাসক মার্কাস অরেলিয়াস তাঁর দার্শনিক লেখার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। রাজত্ব উত্তরে স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে নীলনদ ও এ্যাটলান্টিক মহাসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই যুগে দাস-প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত রোমান সমাজের সর্বাধিক উন্নতি হয়।

তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের অবসান হয়। সাম্রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সম্রাটরা নতুন শাসন-ব্যবস্থা "ডোমিনেট" তৈরি করলেন। গণতান্ত্রিক সবকিছুই বিসর্জন দেওয়া হল। সেনেটের আর কোনও ক্ষমতা রইল না। এই যুগের সম্রাট ডাইওক্লোসিয়ান (২৪৮-৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ) সাম্রাজ্যের শক্তিকে পুনরায় সংহত করলেন। তাঁর পরে বিখ্যাত সম্রাট হন কন্‌স্টান্‌টাইন্‌। তিনি বুদ্ধিমান ও পারদর্শী শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বস্‌ফরাসের তীরে বাইজান্‌টাইনে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাম হল কন্‌স্টান্টিনোপল। কিছুদিনের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ক্রমে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই সাম্রাজ্যে শেষ আঘাত হানে উত্তরদিকের অভিযানকারীরা। বর্বর জার্মান জাতি গথ, ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ ও ভাণ্ডালদের আক্রমণে রোম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতদিন এরা রোমের আশপাশ অঞ্চলে অভিযান করছিল। কিন্তু ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডালরা শেষ রোমান সম্রাটকে উচ্ছেদ করে রাজত্ব স্থাপন করে। এইভাবে শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

সম্রাটদের আমলে সাম্রাজ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর নগর গড়ে ওঠে। বিরাট বিরাট অট্টালিকা, উন্মুক্ত বিচারালয়, রঙ্গভূমি, সাধারণ স্নানাগার ও বিজয়তোরণ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে রোম শহর রমণীয় রূপ ধারণ করে। নীরোর তৈরী "স্বর্ণমন্দির" ও সম্রাট ভিস্‌পাসিয়ানের তৈরী কলোসিয়াম রোমের বিখ্যাত প্রাসাদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরে খেলার মাঠ, গ্যালারি, রঙ্গমঞ্চ, সাধারণ পাঠাগার, স্নানাগার, ভিলা, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

কলোসিয়াম

খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব : খ্রীষ্টধর্ম প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যে আবির্ভূত হয় ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে দ্রুত প্রসার লাভ করে। রোমের পুরানো ধর্ম ও দেবদেবী রোমানদের মানসিক সন্তুষ্টি করতে পারছিল না। সম্রাটরাও তাঁদের চরিত্র-মহিমা দিয়ে রোমানদের মনের শূন্যতা ভরাতে পারছিলেন না। এর ফলে রোম সাম্রাজ্যে প্রাচ্যের নানা দেবদেবী ও ধর্মের আরাধনা শুরু হয় ; যেমন—মিশরের দেবতা ইসিস্, পারস্যের দেবতা মিথ্রাস, ইহুদীদের দেবতা জেহোবা এবং সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান খ্রীষ্টধর্ম।

এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জেসাস্ জেরুজালেমের বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ৩০ বছর বয়সের আগে তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু শোনা বা জানা যায়নি। তিনি ভগবানের পুত্র ও মনুষ্য সাধারণের রক্ষাকর্তা বলে পরিচিত হন। কথিত আছে, তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাতেন ও তাঁর ধর্মমতের কথা প্রচার করতেন। তাঁর সরল জীবন, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সবার প্রতি দয়া দেখে জনসাধারণ তাঁর প্রচলিত ধর্মের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম তাঁর নাম অনুযায়ী খ্রীষ্টান ধর্ম বলে পরিচিত হয়। ভয়হীনতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার স্বভাব তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি করে। শত্রুরা প্যালেস্টাইনের রোমান শাসক পান্টিয়াস্ পিলেটের কাছে নালিশ করল যে, জেসাস্ নিজেকে জেরুজালেমের রাজা বলে প্রচার করছেন ও লোকদের রোমান শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন। তাঁকে বন্দী করা হল ও ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হল। এই কারণে ক্রুশ খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র বলে পরিগণিত। খ্রীষ্টভক্তরা বিশ্বাস করেন, জেসাস্ তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে ফিরে আসেন—একে বলা হয় রেজারেকসন্ বা মুক্তি। প্রতি বছর এই ঘটনা স্মরণ করার জন্য 'ইস্টার' পালন করা হয়। জেসাস্‌কে ক্রুশবিদ্ধ করার দিন 'গুড ফ্রাইডে' পালন করা হয়। 'খ্রীষ্টমাস' জেসাসের জন্মদিন।

খ্রীষ্টধর্ম প্যালেস্টাইনে উদ্ভূত হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ও শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এই ধর্মের সরলতা, প্রচারকদের সরল জীবনযাত্রা ও মৃত্যুর পর জীবনে বিশ্বাস সবাইকে আকৃষ্ট করে। যখন রোমান সমাজ এই ধর্মকে গ্রহণ করল, তখন খ্রীষ্টধর্ম উন্নতির নতুন দিগন্তে পৌঁছল। ক্রমে রোমান সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এই ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। রোমান সম্রাটরা অনুভব করলেন যে, এই নতুন ধর্ম বশ্যতার শিক্ষা দেয় ও পরবর্তী জীবনে পুরস্কারের কথা বলে। সুতরাং, তাঁরা এই ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই কারণে রাষ্ট্র ও খ্রীষ্টান চার্চের মধ্যে বিরোধ মিটে গেল। খুব সম্ভবতঃ রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্ প্রথমে এই ধর্মমত গ্রহণ করেন। কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যে সরকারী ধর্মে পরিণত হয়। চার্চ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিষ্কার ভাবে ভাগ করে নেওয়া হল—খ্রীষ্টকে 'স্বর্গের রাজা' ও রোমান সম্রাটকে 'পৃথিবীর রাজা' বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

প্রশ্নাবলী

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন :**

(ক) রোম নগরের পত্তন হয় কিভাবে?

(খ) কার্থেজ কারা? কার্থেজ ও রোমের বিবাদের কারণ নির্ণয় কর। কারা পরাজিত হয়?

(গ) প্রাচীন রোমান সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(ঘ) স্পার্টাকাস্ কে ছিলেন? তাঁর নেতৃত্বে প্রাচীন রোমের দাস-বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণনা কর।

(ঙ) প্রাচীন রোমে দাস কাদের বলা হত? দাস-বিদ্রোহের বর্ণনা দাও। এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কি?

(চ) জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন? তাঁকে হত্যা করা হয় কেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ছ) রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল কেন?

(জ) রোমান সাম্রাজ্যের নিকট পৃথিবী কিভাবে ঋণী?

(ঝ) খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ঞ) "প্যাকাস্ রোমানা" কথার অর্থ কি? কার রাজত্বকালে রোমকে এই কথা বলা হত?

২। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :**

(ক) ইটালী কোথায় অবস্থিত? এখানকার অধিবাসীরা কোথা থেকে ভারতে আসে?

(খ) আদি ইটালীয়রা কাদের কাছ থেকে অক্ষর, ধর্মমত ও শিল্প শিক্ষালাভ করেছিল?

(গ) কত খ্রীঃ পূঃ, কে, কিভাবে রোম নগরীর পত্তন করেন?

(ঘ) রোমে কত খ্রীঃ পূঃ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়? প্রজাতন্ত্র কাদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন?

(ঙ) ফিনিসীয়রা কোথায় বাস করত? তাদের রাজধানীর নাম কি ছিল? তাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(চ) পিউনিকের যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হয় এবং কি কি কারণে? যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

(ছ) রেজারেক্‌সন্ কাকে বলে?

(জ) খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে প্রসার লাভ করে? প্রথমে কোন্ সম্রাট এই ধর্ম গ্রহণ করেন?

(ঝ) 'লাটিকান্‌দিয়া' কথার অর্থ কি? এই প্রতিষ্ঠান কেন গড়ে উঠে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চীন (China)

চীনের প্রথম ঐতিহাসিক সভ্যতা যার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা আমাদের পরিচিত করেছেন, তা হল সাং-সভ্যতা। অনুমান করা হয় সাং-শাসকরা খ্রীঃ পূঃ ১৭৬৫ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১১২২ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সাং-সভ্যতার মানুষ যে উন্নত শ্রেণীর সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তা অন্য যে কোনও সভ্যতার সমান ছিল। এই সময় তাঁরা ধাতুর ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করেন ও লেখাও আয়ত্ত করেন। সেই সময়ের কবর থেকে নানা সুন্দর জিনিস আবিষ্কার করা দেখে মনে হয় তাঁরা দক্ষ শিল্পী ছিলেন।

সাং-আমলে চীনে খুবই উন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। ঐ সময়ে চীনাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ। রাজা কৃষকদের কখন ফসল বুনতে হবে, আর কখন কাটতে হবে নির্দেশ দিতেন। চীনে সে সময় রেশম, শন প্রভৃতি থেকে কাপড় তৈরি হত। পশমের শালেরও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। প্রধানত, রেশম, পশম ইত্যাদির তৈরী কাপড় রপ্তানি করা হত ও বিদেশ থেকে কড়ি, শাঁখ, নুন, দামী পাথর আমদানি করা হত। সাংদের ধ্বংসাবশেষ থেকে বহু কচ্ছপের খোলা পাওয়া গেছে। অনেক খোলার ওপর নানা রকমের আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। নানা ধরনের রং-করা পাত্র ও ব্রোঞ্জের তৈরী সামগ্রীও পাওয়া গেছে। সাং রাজাদের সময়ে চীনের সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রাজা ছিলেন সমাজের মাথায়, আর দাসরা ছিল সবচেয়ে নীচে। রাজা ও দাসদের মধ্যে ছিল অভিজাত, ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায়। সে যুগের চীনারা মৃত পূর্বপুরুষদের দেবতা হিসেবে পূজো করত।

সাং-বংশের শেষ রাজা পার্শ্ববর্তী চৌ-বংশের "ফা"-এর দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। অতঃপর চৌ-বংশ নাম দিয়ে "ফা" তাঁর রাজত্ব শুরু করেন। চীনের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বিপ্লব। "চৌ"-রাজত্ব চীনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। এই বংশের সরকারী নিয়মকানুন ও রাজত্ব-প্রণালীর বিবরণ চউ-লি পড়ে

তাঁদের দক্ষতাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। এই সময় কৃষি ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল। প্রথম সম্রাটদের আমলে সিয়া ও সাং-রাজত্বের সময় যে জায়গিরদান-প্রণালীর গোড়াপত্তন হয়েছিল, চৌ-রাজত্বকালে তা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। চৌ-রাজত্বকালে বহু মুনিঋষির আবির্ভাব হয়েছিল। মহাপ্রাণ লাও-তুং, কন্‌ফুসিয়াস্ এবং মেন্‌সিয়ুস্ এই সময়ের লোক।

কন্‌ফুসিয়াস্ঃ কন্‌ফুসিয়াস্, যাঁর আসল নাম ছিল কুয়াং-থু, ৫৫১ খ্রীঃ পূঃ চীনের লু রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মা অনেক কষ্টে তাঁকে লালনপালন করেন। দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি সঙ্গীত ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। সমগ্র চীন তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল; পরস্পরের মধ্যে আদৌ সদ্ভাব ছিল না। উত্তর দিক থেকে বর্বরজাতির লোকেরা এসে চীন আক্রমণ করল। দেশময় দেখা দিল অরাজকতা, চুরি, ডাকাতি, দুর্ভিক্ষ; লোকের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। চীনের মানুষের দুঃখবেদনা কন্‌ফুসিয়াস্‌কে বিচলিত করল। কিভাবে মানুষের উন্নতি করা যায়, কেমন করে তারা নিজেরাই দুঃখকষ্টের লাঘব করতে পারে—এই চিন্তাই তিনি গভীরভাবে করেছেন। তাঁর এই চিন্তার ফসলই হল তাঁর বিখ্যাত মতবাদসমূহ।

বাইশ বছর বয়সে কন্‌ফুসিয়াস্ নিজের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় খোলেন। অনেক যুবক সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত। বিদ্যালয়ে ইতিহাস, কাব্য ও নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। তিনি সক্রেটিসের মত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। শিষ্যরা তাঁকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করত। কন্‌ফুসিয়াস্ কয়েক বছর চাকরি করেছিলেন। তিনি চুংটু শহরের প্রধান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকবার সময় তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অনেকগুলো আইনকানুন তৈরি করেন। কিন্তু রাজার

কন্‌ফুসিয়াস্

চরিত্রের অবনতি হলে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। এরপর তিনি তের বছর চীনদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তাঁর উপদেশাবলী প্রচার করলেন। "উয়ে" প্রদেশের শাসক কনফুসিয়াস্‌কে তাঁর সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু প্রদেশের শাসকের নীতিগুলো ভাল না থাকায় তিনি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

কনফুসিয়াসের ঊনষাট বছর বয়সে "লু" প্রদেশের শাসক তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এরপর আরও পাঁচ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। কনফুসিয়াস্ তাঁর উপদেশাবলী পাঁচ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করে যান, যা চীনে পাঁচটি 'চিং' নামে পরিচিত। তিনি বলেছেন, প্রাচীন সম্রাটরা যখন সাম্রাজ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তখন নিজের রাজ্যে আগে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা আনার আগে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করেছেন; পরিবারকে নিয়ন্ত্রিত করার আগে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন; নিজেদের উপযুক্ত করার আগে তাঁরা হৃদয়কে ঠিক করেছেন। তিনি ত্যাগের উপদেশ দেননি। তিনি বলতেন সংসারে থেকে সমাজব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা দুঃখ-কষ্টের কারণকে নির্মূল করা যায়। তাঁর মতে, যথাযথ ভাবে নীতি ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা করাই মানুষের চরিত্রের মহৎ আদর্শ। তিনি বলতেন, "যে গরীব হয়ে অপরের তোষামোদ করে না ও ধনী হয়েও অহঙ্কার করে না, সে-ই প্রকৃতপক্ষে মানুষ।" তিনি আবার বলেছেন, "যে রকম ব্যবহার পেলে তুমি নিজে ব্যথা পাবে, কারও সঙ্গে কখনও তেমন ব্যবহার করবে না।"

চীন রাজবংশ ঃ চীন রাজবংশ ২৪৯ খ্রীঃ পূঃ থেকে ২০৬ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে। চৌ রাজবংশের শেষদিকে চীন রাজ্য চীনের অন্যান্য রাজ্য থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও চৌ-দের পতনের পর চীনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন সি-ওয়াং-টিং যিনি নিজেকে "চীন সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি চীনের সব অঞ্চল দখল করেন। তাঁর আমলে চীন সাম্রাজ্য মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। চীনের সমস্ত জমিদার ও সামন্তদের দমন করে তিনি একটি শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমলে বড় বড়

সড়ক ও বহু জলসেচের খাল তৈরি হয়। তিনি অনেক কৃষ্টিমূলক ও অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। সর্বত্রই একই রকম মাপ ও ওজনের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে চৈনিক অক্ষর আধুনিক রূপ পায়। বর্বর যাযাবরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁর সময়ে চীনের প্রাচীর তৈরি হয়। বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এর আগেই চীনের উত্তর দিকে কিছু প্রাচীর ছিল। কিন্তু চীন সম্রাট ২১৪ খ্রীঃ পূঃ সমস্ত প্রাচীরকে একত্রিত করে চীনের উত্তর দিকে বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করলেন। এই বিখ্যাত প্রাচীর নদী-পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে ১৫,০০০ মাইল লম্বা ছিল। এই প্রাচীর পিকিং শহরের বিপরীত দিকে সান্-হাই-কোয়ান্ থেকে শুরু হয়ে গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীরের দু'দিকে ইট বা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল ও মধ্যভাগ মাটি দিয়ে ভরা। প্রাচীরটি ১৫ ফুট উঁচু ছিল এবং মধ্যের রাস্তাও ১৫ ফুট চওড়া ছিল। প্রতি এক শ গজ দূরে একটি করে
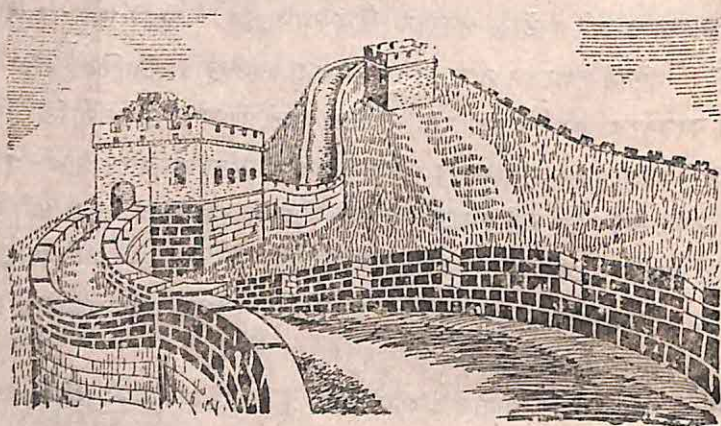
চীনের প্রাচীর

সুরক্ষিত গম্বুজ ছিল। চীন সম্রাট ছিলেন স্বৈরাচারী, তিনি কন্‌ফুসিয়াসের গণতান্ত্রিক উপদেশাবলী পছন্দ করতেন না। সুতরাং তাঁর নির্দেশে কৃষিকাজ, ঔষধ ও দেবদেবীর আরাধনা-সংক্রান্ত উপদেশাবলী বাদ দিয়ে কন্‌ফুসিয়াসের সব বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসনে দেশের অধিবাসীরা অসন্তুষ্ট হয়। কন্‌ফুসিয়াস্‌পন্থীদের চেষ্টায় এই অসন্তুষ্টি আরও বেড়ে যায়। ফলে সি-ওয়াং-টিং-এর মৃত্যুর পর চীন রাজবংশকে উচ্ছেদ করে হান-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) চীনের সাং-সভ্যতা সম্পর্কে যা জান লেখ।
(খ) সাং-সভ্যতার আমলে চীনের সামাজিক অবস্থা কি রকম ছিল ?
(গ) চৌ-রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।
(ঘ) কনফুসিয়াসের জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা কর।
(ঙ) চীন রাজবংশের আমলে চীনের ইতিহাস আলোচনা কর।

২। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) চীনের প্রথম ঐতিহাসিক সভ্যতা কোন্‌টি ? সেই সময়ের কৃষিকাজ সম্পর্কে লেখ।
(খ) সাং-সভ্যতার যুগে সামাজিক অবস্থা কি রকম ছিল ?
(গ) চৌ-রাজত্বকে চীনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ?
(ঘ) চৌ-রাজত্বকালে সামন্ত-প্রথা কি রকম ছিল ?
(ঙ) কনফুসিয়াসের ছোটবেলা সম্পর্কে যা জান লেখ।
(চ) কনফুসিয়াসের শিক্ষাদান-প্রণালী কিরূপ ছিল ?
(ছ) তিনি কোথায় ও কিভাবে চাকুরি করেন ?
(জ) কনফুসিয়াসের প্রধান উপদেশসমূহ কি ছিল ?
(ঝ) চীন বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক কে ছিলেন ? তাঁর রাজত্বকালের বর্ণনা দাও।
(ঞ) চীন রাজবংশের সময়ে চীনের প্রাচীর কেন তৈরি করা হয়েছিল ? এই প্রাচীর সম্পর্কে যা জান লিখ।
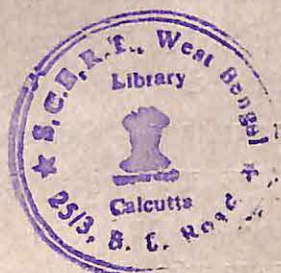
সিন্ধু-সভ্যতার পর ভারতবর্ষে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা আর্য-সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা নামে পরিচিত। আর্য কোনও জাতি নয়; আর্য ভাষায় যারা কথা বলত, তারাই আর্য নামে পরিচিত। সংস্কৃত, লাতিন, পারসিক, জার্মান প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়েছে মূল আর্য ভাষা থেকে। আর্যরা ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও উচ্চনাসাযুক্ত।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিল। মধ্য এশিয়া অথবা মধ্য বা পূর্ব ইউরোপ তাদের বাসভূমি ছিল। খাদ্যাভাব বা গৃহবিবাদের ফলে তারা নিজবাসভূমি ত্যাগ করে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যরা সম্ভবত উত্তর-পূর্ব ইরান ও কাস্‌পিয়ান হ্রদ অঞ্চল থেকে ভারতে প্রবেশ করে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ)। ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যত্রগামী আর্যদের সঙ্গে ভারতে আগত আর্যদের পৃথক করার জন্য তাদের ইন্দো-এরিয়ান বলা হয়। আর্যরা প্রথমে পাঞ্জাবে সিন্ধু ও তার শাখা-নদীগুলো বিধৌত সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে তারা দক্ষিণ-পূর্বদিকে ও দিল্লীর উত্তর ভাগে অগ্রসর হয়। এর কিছুদিন পর আরও পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে আর্যরা অগ্রসর হয়।

বেদ ঃ আর্যদের রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম "বেদ"। বেদ শব্দের অর্থ "জ্ঞান"। হিন্দুদের বিশ্বাস 'বেদ' অপৌরুষেয়—ঈশ্বরের বাণী। গুরুর মুখ থেকে বেদের বাণী শুনে শিষ্যরা কণ্ঠস্থ করত। তাই বেদের আর এক নাম "শ্রুতি"। বেদ চারভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিটি বেদের চারটি অংশ—(১) সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ্। সংহিতা অংশ পদ্যে রচিত ও বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রের সমষ্টি। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত যাগযজ্ঞের সমষ্টি। আরণ্যক গৃহত্যাগী অরণ্যবাসীর ধর্ম, জীবন-যাপন ও উপাসনার সম্বন্ধে রচিত। উপনিষদ্ আর্যদের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ। বেদের মধ্যে ঋক্‌বেদ সবথেকে প্রাচীন ও পদ্যে রচিত। সামবেদ অনেক মন্ত্র ও স্তোত্র নিয়ে রচিত। যজুর্বেদে যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপের কথা আছে। শত্রুদমন ও বিপদ দূর ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অথর্ববেদ রচিত হয়। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা ও

অবগতির জন্য বেদাঙ্গ রচিত হয়েছিল। বেদাঙ্গর ছয় ভাগ—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। বৈদিক সাহিত্যের দর্শন ও সাহিত্য ছয় ভাগে বিভক্ত ; —সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা।

প্রাচীন আর্যসমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক সংগঠন : প্রাচীন আর্য-সমাজ ছিল পরিবার-ভিত্তিক। পরিবারের প্রধান ছিলেন পিতা। পরিবারের সকলকে তাঁর আদেশ ও নির্দেশ পালন করতে হত। সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত। প্রথমদিকে আর্যদের মধ্যে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ছিল না। পরে পূজো ও উপাসনা, দেশরক্ষা, কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজের জন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন হয়। যাঁরা বিদ্যাচর্চা, যাগযজ্ঞ ও পূজো-উপাসনা নিয়ে থাকতেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। দেশরক্ষা ও শাসনে নিযুক্ত যাঁরা, তাঁদের ক্ষত্রিয়, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিতে নিযুক্ত যাঁরা, তাঁদের বৈশ্য বলা হত। যাঁরা এই তিন শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত হলেন, তাঁরা দাস বা শূদ্র নামে পরিচিত হন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল না। বৈদিক যুগের শেষভাগে বর্ণভেদ ক্রমে জাতিভেদে পরিণত হয় ও সামাজিক উদারতা নষ্ট হয়ে যায়। আর্যসমাজের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল চতুরাশ্রম। এই ব্যবস্থা সমাজের প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। চারটি আশ্রম হল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বাল্যকালে গুরুগৃহে অধ্যয়ন ও শিক্ষা ছিল ব্রহ্মচর্য। গার্হস্থ্য জীবনে ছিল সংসারধর্ম করা। প্রৌঢ় বয়সে সংসার-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণ বা বনে জীবনযাপন করা। বৃদ্ধ-বয়সে নিয়ম ছিল যোগীর জীবনযাপন করা।

ধর্ম ছিল আর্য সমাজ ও সভ্যতার মূল ভিত্তি। বৈদিক আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর। ঋক্‌বেদের স্তোত্রে আমরা শুনতে পাই বৈদিক যুগের মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশে বিস্ময় প্রকাশ করছে ও স্তুতি করছে। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবী কল্পনা করে তারা উপাসনা করত। দেবদেবীর মধ্যে প্রধান ছিলেন আকাশের দেবতা দ্যৌঃ, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য, বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বায়ুর দেবতা মরুৎ,

আলোর দেবতা সূর্য, তেজের দেবতা অগ্নি, ভোরের দেবতা ঊষা ইত্যাদি। বৈদিক আর্যদের মধ্যে মূর্তি-পূজোর প্রচলন ছিল না। যজ্ঞে ঘৃতাহুতি ও স্তবস্তুতি পাঠই ছিল উপাসনার প্রধান অংশ। ক্রমে ব্রাহ্মণের যুগে উপাসনা-পদ্ধতি জটিল ও নিয়ম-প্রধান হয়ে ওঠে ও এইসব কর্মকাণ্ডের জন্য পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বহুদিন একসঙ্গে বসবাসের ফলে অনার্যদের কিছু রীতিনীতি আর্যসমাজে প্রবেশ করে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, আর্যরা মূলতঃ একটি শক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। ঋক্‌বেদে যেসব দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, তা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপে প্রকাশমাত্র। আর্যরা বিশ্বাস করত মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী পুরস্কৃত হয় বা শাস্তি পায়। এই জীবনে সৌভাগ্যলাভ বা উচ্চশ্রেণীতে জন্ম মানুষের পূর্বজন্মের কর্মফল, আর নিম্নশ্রেণীতে জন্ম ও শাস্তিভোগ তার পূর্বজন্মের খারাপ কাজের কুফল।

ভারতে প্রবেশের পর আর্যরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল নানা স্থানে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। এইসব ছোট ছোট রাজ্যের শাসনভার ছিল দলপতির ওপর। ক্রমে যুদ্ধের ফলে রাজ্য বিস্তারলাভ করে ও দলপতির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। 'দলপতি'র ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হলে তিনি "রাজা" বা "রাজন" নামে পরিচিত হন। "রাজা" বা "রাজন" পদ ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। প্রাচীন আর্যদের যুগে সমাজ বা রাষ্ট্র ছিল পরিবারের মত। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি "গ্রামণী" বলে পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত "বিশ" বা "জন"। "বিশ" বা "জনের" অধিপতি ছিলেন রাজা। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজা কর্মচারীদের সাহায্য নিয়ে রাজ্য চালাতেন। রাজার রাজ্যশাসনে বিশেষভাবে সাহায্য করত "সেনানী" ও "পুরোহিত"। রাজা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। রাজাকে "সভা" ও "সমিতি" নামে দুটি পরিষদের পরামর্শ নিতে হত। "সমিতি" মনে হয় সাধারণ সভা ছিল, যেখানে গোষ্ঠীর সবাই যোগ দিত। "সভা" বোধ হয় নির্বাচিত বিশেষ কয়েক জনের সভা ছিল, যারা দৈনন্দিন শাসন-ব্যাপারে রাজাকে উপদেশ দিত।

সার্বভৌমত্ব লাভের জন্য রাজারা রাজসূয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন ও সম্রাট, একরাট, রাজচক্রবর্তী ইত্যাদি উপাধি নিতেন।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য—মহাকাব্যদ্বয়ঃ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য রচিত। এই দুই মহাকাব্যের ঘটনাবলী, অনুমান করা হয়, ১০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৭০০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে ঘটেছিল। রামায়ণে রামের কাহিনী বলা হয়েছে। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য স্ব-ইচ্ছায় তাঁর পত্নী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে যান। সেইখানে তাঁকে নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়। অবশেষে তিনি অযোধ্যায় ফিরে ভাই-বন্ধু ও প্রজাবৃন্দের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই মহাকাব্যদ্বয় পরবর্তী কালের বৈদিক সভ্যতার সৃষ্টি। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী দীর্ঘদিন লোকমুখে "গাথা" হিসেবে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন্‌টি আগে রচিত, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রামায়ণ ও মহাভারত ঠিক ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তবুও বৈদিক যুগের শেষদিকের সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এই দুই মহাকাব্য থেকে পাওয়া যায়।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণ চল্লিশ হাজার শ্লোক সম্বলিত। বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা ছাড়াও রামায়ণে রাক্ষস বা অনার্য-সভ্যতার চিত্র আছে। এই মহাকাব্য থেকে আর্য-সভ্যতার বিস্তার বোঝা যায়। ঐ সময় রাষ্ট্র ছিল রাজতান্ত্রিক। রাজা প্রজার কল্যাণকামী ছিলেন। জাতিভেদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল। বহুবিবাহ ও স্বয়ম্বর-ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত ছিল। সমাজে তখন পুরোহিতরা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

বেদব্যাস রচিত মহাভারতে আর্য ও অনার্যের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ নেই। মনে হয় আর্য সভ্যতা ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়েছে। এই সময় ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য কমে যায়। সভা থাকলেও রাজতন্ত্র খুবই শক্তিশালী ছিল। রাজসভা রাজাকে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহে পরামর্শ দিত। জাতিভেদ প্রথা থাকলেও শূদ্রের পক্ষে জপতপ

ও বিদ্যালাভ নিষিদ্ধ ছিল না। বহুবিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, পিতামাতার আদেশ পালন, সত্য ও সততা রক্ষা তখন সমাজে আদর্শরূপে পরিগণিত হত। মহাভারতের সময়ে শিব ও বিষ্ণু পূজা বিস্তারলাভ করেছিল।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঃ বৈদিক যুগের শেষদিকে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা অতি জটিল ও পুরোহিত-প্রধান হয়ে ওঠে। উপনিষদের সরল ধর্ম ও আদর্শ লুপ্ত হয়ে কতক জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম, পূজা-বিধি প্রচলিত হল। সমাজে পুরোহিত শ্রেণী প্রধান হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণদের এই ক্ষমতায় ক্ষত্রিয়শ্রেণী ক্ষুব্ধ হয়, উত্তর ভারতে ধর্মবিপ্লব শুরু করে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এরই ফলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ঘটে। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশজাত।

মহাবীর ঃ উত্তর বিহারের বৈশালীর কাছে কুন্দপুর নামক স্থানে এক ক্ষত্রিয় দলপতি সিদ্ধার্থের পুত্র ছিলেন মহাবীর। মহাবীরের মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিবংশীয় রাজকন্যা। সংসার-জীবনে মহাবীরের নাম ছিল 'বর্ধমান'। তিনি যশোদা নামে এক কুমারীকে বিবাহ করেন ও তাঁর একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গৃহী-জীবন যাপন করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গোঁসালা নামে একজন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীর্ঘ বারো বছর কঠোর সাধনায় রত থাকেন। এরপর তিনি কৈবল্য বা দিব্যজ্ঞান লাভ করে 'জিন' ও নিগ্রন্থ নামে পরিচিত হন। 'জিন' থেকে 'জৈন' শব্দের উদ্ভব হয়। 'জিন' শব্দের অর্থ সমস্ত রকম ঐহিক দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ।

মহাবীর

তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় জৈন ধর্ম। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই তীর্থঙ্করদের মধ্যে শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ। মহাবীর পার্শ্বনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পরবর্তী ত্রিশ বছর তিনি ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন। সিদ্ধিলাভের পর মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে তিনি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে বর্তমান পাটনা জেলায় পাবা নামক স্থানে মহাবীর দেহত্যাগ করেন।

মহাবীর প্রচারিত ধর্মমত নিগ্র'ন্থ নামে পরিচিত। নিগ্র'ন্থ কথার অর্থ মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি সাংসারিক মোহ থেকে মুক্তি। মহাবীর সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান ও সত্য আচরণের কথাও প্রচার করেন। তিনি বলেন, পাপপুণ্য নিজের কর্মের ফল, মানুষ এই কর্মফল ভোগ করে। জৈন ধর্ম ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তবে হিন্দুদের মত তাঁরা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। "অহিংসা পরম ধর্ম" জৈন ধর্মের মূল নীতি। তাঁরা বিশ্বাস করেন প্রতিটি জিনিসের প্রাণ আছে; —তাই অহিংসা, সর্বজীবে দয়া ও ইন্দ্রিয়জয় তাঁদের মূল মন্ত্র। পরবর্তিকালে জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরেন, তাঁরা 'শ্বেতাম্বর' ও যাঁরা কোন বস্ত্রই ব্যবহার করেন না, তাঁরা 'দিগম্বর' বলে পরিচিত হন।

গৌতম বুদ্ধ : হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোদন ও রানী মায়ার পুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ বা গৌতম। জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মা মারা যান। তিনি বিমাতা ও মাতৃসমা গৌতমীর কাছে লালিত-পালিত হন। তাই তাঁর অপর নাম গৌতম। ছোটবেলা থেকে সিদ্ধার্থ ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। বিলাস ও ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর বিরূপতা প্রকাশ পেতে থাকে। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই ভাব দেখে তাঁকে সংসারে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁর ষোল বছর বয়সে 'গোপা' নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন। সিদ্ধার্থ একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোককে ও এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে পথে দেখতে পেলেন। আর একদিন দেখলেন এক মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি সারথি ছন্দকের কাছে শুনলেন, জগতের সমস্ত লোকেরই এই পরিণতি। তিনি স্থির

করলেন, মানুষের অপার দুঃখ মোচনের পথ বের করবেন। উনত্রিশ বছর বয়সে "রাহুল" নামে তাঁর এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের জন্মের পর তিনি ক্রমেই সংসারে জড়িয়ে পড়ছেন দেখে একদিন গভীর রাতে স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের মায়া কাটিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। এই ঘটনা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে "মহাভিনিষ্ক্রমণ" নামে পরিচিত।

গৌতম বুদ্ধ

গৃহত্যাগের পর গৌতম কিছুকাল বৈশালী ও রাজগৃহে পণ্ডিত ও জ্ঞানী অলড়কসাল ও রুদ্রকের কাছে শাস্ত্র শিক্ষা নেন। কিন্তু তাতে তাঁর মনের তৃষ্ণা মেটে না। তারপর তিনি গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে রত হলেন। তাঁর দেহ দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি শান্তি ও সত্যের সন্ধান পেলেন না। এরপর তিনি একদিন নৈরঞ্জনা নদীতে (বর্তমান ফল্গু) স্নান করে গয়ার কাছে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এইভাবে তিনি একদিন 'বোধি' বা সত্য জ্ঞান লাভ করলেন। সেই সময় থেকে তাঁর নাম হয় 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী ও তথাগত, যিনি সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাঁর তপস্যার স্থানের নাম হয় "বুদ্ধগয়া" ও অশ্বত্থ গাছটি "বোধিদ্রুম" নামে পরিচিত হয়। তিনি যে ধর্ম প্রচার করলেন, তার নাম হল বৌদ্ধ ধর্ম। বুদ্ধ কাশীর কাছে সারনাথে মৃগবনে তাঁর পাঁচ শিষ্যের কাছে প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন। তিনি কপিলাবস্তুতে ফিরে পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রেয় ভাই নন্দকেও নতুন ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রায় আশি বছর বয়সে বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় কুশীনগরে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই বিষয় "মহাপরিনির্বাণ" নামে পরিচিত।

বুদ্ধের মতে পৃথিবীতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে। দুঃখের কারণ ভোগ-বিলাস। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও লোভ তার অজ্ঞতা থেকেই শুরু। প্রকৃত জ্ঞানের অভাব ও পৃথিবীর সবকিছুর লোভের জন্যই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে। এই কামনা থেকে মানুষের মুক্তিলাভের চেষ্টা করা উচিত। সৎকর্মের ফলে আত্মার উন্নতি করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। আত্মার এই চরম শান্তিই হল "নির্বাণ"। বুদ্ধের মতে অত্যধিক ভোগ ও অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন আত্মার শান্তির বাধাস্বরূপ। তিনি সংযমী হয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি দুঃখ দূর করার জন্য আটটি পথ নির্দেশ করে গেছেন ; তাকে "অষ্টমার্গ" বলা হয়। সেগুলি হল সৎচিন্তা, সৎদৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকার্য, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি, সংজীবন ও সৎ-আদর্শ। তিনি বেদে ও জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। তিনিও অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাস করতেন।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যগণ রাজগৃহে এক বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন। সেখানে বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণীয় বিধি "সূত্রপিটক", "বিনয়পিটক" ও "অভিধর্মপিটক" নামে তিনটি অংশে সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়। এইসব ধর্মগ্রন্থ "ত্রিপিটক" নামে পরিচিত। পরে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী নিয়ে "জাতক" গ্রন্থের সৃষ্টি হয়।

মৌর্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ মগধের উত্থান ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে ষোলটি রাজ্য বা ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাবুল থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত রাজ্যগুলি বিস্তৃত ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে কোশল, অবন্তী, বৎস ও মগধ ছিল শক্তিশালী। এই চারটি রাজ্যের মধ্যে আধিপত্যের জন্য সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ চলত। শেষ পর্যন্ত মগধ অপর তিনটি রাজ্যকে ধ্বংস করে সার্বভৌম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

বিম্বিসার থেকে নন্দ বংশ ঃ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তিনি রাজগৃহে (রাজগীর) রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর আমলে অঙ্গদেশ বা পূর্ব বিহার মগধের অধিকারে আসে। তিনি কাশী ও কোশলের লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। বলা হয়, অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। তিনি খুব প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি কাশী ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে পরাজিত করে কাশী রাজ্য দখল করেন। তারপর একে একে বৃজি, মল্ল প্রভৃতি গণরাষ্ট্র-গুলো মগধের অধিকারে আনেন। তাঁর সময়ে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্রে মগধের বিকল্প রাজধানী স্থাপিত হয়।

অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজাদের দুর্বলতার ফলে দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মগধবাসী অতিষ্ঠ হয়ে মন্ত্রী শিশুনাগকে সিংহাসনে বসান। শিশুনাগ বৎস ও কোশল রাজ্য মগধভুক্ত করেন। শিশুনাগের বংশধরেরা দুর্বল ছিলেন। সেই দুর্বলতার সুযোগে নন্দবংশ মগধের সিংহাসন দখল করেন।

নন্দবংশের রাজা মহাপদ্ম নন্দ রাজ্য-সংগঠক ও বিজেতা হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি মগধকে বিশাল রাজ্যে পরিণত করেন। নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি। তাঁর আমলে চাণক্য নামে তক্ষশীলাবাসী ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন দখল করেন।

মৌর্য বংশ ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪—৩০০ খ্রীঃ পূঃ) ঃ মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে তিনি নন্দদের দাসী মুরার পুত্র। মুরা থেকে মৌর্য বংশের নাম হয়েছে। আবার কারও মতে তিনি পিপ্পলীবনের মৌরীয় ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন। মৌরীয় থেকে মৌর্য নামের উৎপত্তি।

মগধে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে। নন্দবংশের অত্যাচার ও কুশাসনের সময়ে তিনি পাঞ্জাবে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করে নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্য সাহায্য চান। তাঁর নির্ভীক আচরণে আলেক-জাণ্ডার অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বন্দী করার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত পালিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নেন। এই সময়ে চাণক্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। চাণক্যের চেষ্টায় চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। চাণক্যের সাহায্যে তিনি ধননন্দকে বিতাড়িত করে মগধের সিংহাসন দখল

করেন। সিংহাসন দখলের পর চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখলের জন্য উদ্যোগী হন। গ্রীকদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ নিজ অধিকারে আনেন। তাঁর আমলে মালব, সৌরাষ্ট্র ও মহীশূর মগধের অধিকারভুক্ত হয়। গ্রীক সেনাপতি সেলুকস গ্রীক অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে পরাজিত হয়ে হিরাট, কাবুল, মাকরান ও কান্দাহার চন্দ্রগুপ্তের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। দু'জনের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ সেলুকস "মেগাস্থিনিস" নামে এক গ্রীক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠান। কথিত আছে, জৈন রীতি অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত ৩০০ খ্রীঃ পূঃ দেহত্যাগ করেন।

বিন্দুসার (৩০০—২৭৩ খ্রীঃ পূঃ): চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে তক্ষশীলায় এক বিদ্রোহ হয়। রাজপুত্র অশোকের সাহায্যে তিনি সেই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি পিতার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন।

অশোক (২৭৩—২৩৬ খ্রীঃ পূঃ): বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর রাজত্বের প্রথম চার বছর ভ্রাতৃবিরোধে কাটে। বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা ছিলেন। সিংহাসনে বসেই অশোক রাজ্যবিস্তারে মন দেন। পিতার রাজত্বকালে তিনি তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অভিষেকের নয় বছর পরে অশোক কলিঙ্গ রাজ্যটি আক্রমণ করেন। কলিঙ্গ দখল করলেও যুদ্ধজয়ের গৌরব অশোককে শান্তি দিতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রের নৃশংস ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলা অশোকের মনে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি করে। তিনি ভাবলেন এইসব দুঃখ-দুর্দশার জন্য তিনিই দায়ী। তিনি সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

অশোক

অশোক যুদ্ধজয়ের নীতি ত্যাগ করে ধর্মজয়ের নীতি অনুসরণ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে অশোক অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচারে মন দিলেন।

অশোকের ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের নীতিরও পরিবর্তন হল। তাঁর আদর্শ হল মানুষের মঙ্গলসাধন ও পারলৌকিক জীবনের উন্নতিবিধান। প্রজাদের তিনি আপন সন্তানের মত দেখতে শুরু করলেন। বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, সরাইখানা নির্মাণ, কূপখনন,

মানুষ ও পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি করে তিনি শাসনকে প্রজার মঙ্গলে প্রয়োগ করলেন। পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি রাজ্যজয়ের পরিবর্তে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করেন।

বুদ্ধদেবের স্মৃতি-সম্বলিত বিভিন্ন স্থান তিনি পরিদর্শন করেন। পাথরে ও স্তম্ভে উৎকীর্ণ অসংখ্য লিপি থেকে অশোকের বাণী জানা যায়। তাঁর ধর্ম ঠিক বৌদ্ধধর্ম ছিল না। তিনি প্রজাদের কতকগুলো আদর্শ পালনের কথা বলেছিলেন—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, মানুষের মঙ্গলসাধন, জীবের প্রতি দয়া, সভ্যভাষণ, শিক্ষক ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, দাসদাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও ভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। সুবিশাল রাজ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর নতুন কর্মচারী নিয়োগ করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি পুত্র মহেন্দ্র (অন্য মতে ভাই) ও কন্যা (অন্য মতে বোন) সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠান। তাঁরই চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়।

নিঃসন্দেহে অশোক মৌর্য তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর মানবতা ও রাজ্যাদর্শ তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে অন্যতম স্থান দিয়েছে।

ইন্দো, গ্রীক, শক ও কুষাণ: সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা মৌর্য সাম্রাজ্য শাসনের অযোগ্য হয়ে পড়েন; সেই সুযোগে ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক, পার্থীয় ও সীথিয়, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোক উত্তর-পশ্চিম পথে ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন অংশে রাজ্যস্থাপন করে।

গ্রীক রাজারা রাজ্যবিস্তার করতে করতে পাঞ্জাব ও কাবুল উপত্যকা দখল করেন। এই এলাকাকে গান্ধার প্রদেশ বলা হয় ও গ্রীকরা এই অঞ্চল প্রায় একশো বছর অধিকারে রাখে। গ্রীকদের অন্যতম রাজা মিনান্দার জ্ঞানী ও শক্তিশালী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও ভারতীয় জীবনযাত্রা অনুসরণ করেন।

গ্রীকদের পর পার্থীয় জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। পার্থীয় রাজাদের মধ্যে গণ্ডোফারনিস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কাবুল, কান্দাহার এবং তক্ষশীলা রাজ্য গণ্ডোফারনিসের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে আসেন শকরা। তাঁরা সিন্ধু ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চল দখল

করে কাথিয়াওয়াড় ও মালবে বসতি স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ যুদ্ধ হয়। শক রাজা রুদ্রদামন নর্মদা নদীর উত্তর অংশে সাতবাহনদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বাধা দেন। শকরা কুষাণদের জন্য উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে পারেননি।

কুষাণ বংশ ঃ মধ্য এশিয়া থেকে কুষাণজাতির লোক এসে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ জয় করে নেয়। কুষাণগণ চীনরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী 'ইউচি' জাতির একটি শাখা। কুষাণদের প্রথম পরাক্রমশালী রাজার নাম কুজুল্ কারা কদ্‌ফিসিস্। তিনি পহ্লবদের পরাজিত করে পারস্যের সীমান্ত থেকে সিন্ধু অঞ্চল পর্যন্ত কুষাণ রাজত্ব বিস্তার করেন। পরবর্তী রাজা বীম কদ্‌ফিসিস্ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অঞ্চল দখল করেন।

কনিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কনিষ্ক। তিনি বীম কদ্‌ফিসিসের পর সিংহাসনে বসেন। অনেকের মতে কনিষ্ক সিংহাসনে বসে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি সম্বৎ প্রচলিত করেন, — যার নাম 'শকাব্দ'। তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। খোরাসান থেকে শুরু করে কাবুল, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, এমন কি কাশ্মীরও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, তাঁর সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে বেনারস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজধানী পুরুষপুরে এক বিরাট বৌদ্ধ

চৈত্য নির্মাণ করেন ও তাঁর সময়ে পুরুষপুর (পেশোয়ার) বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্ম 'মহাযান' ও 'হীনযান' এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই পার্থক্য দূর করবার জন্য তিনি কাশ্মীরে (অন্য মতে জলন্ধরে) এক মহাবৌদ্ধ-সম্মেলন আহ্বান করেন। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, কবি অশ্বঘোষ, আয়ুর্বেদশাস্ত্র-রচয়িতা চরক প্রভৃতি গুণীজন তাঁর রাজসভায় অবস্থান করতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিখ্যাত গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তরা শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীদের বিতাড়িত করে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ভারতের এক গৌরবময় যুগের সূচনা করেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ গুপ্তদের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় না। তবে দক্ষিণ বিহারে একটি রাজ্যে শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁরই পৌত্র "প্রথম চন্দ্রগুপ্ত" গুপ্ত বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা। ইনি সম্ভবত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র নগর। তিনি লিচ্ছবিবংশীয় কুমারদেবীকে বিয়ে করে বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়ান। প্রয়াগ, অযোধ্যা ও দক্ষিণ বিহার পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে তিনি প্রথমেই দিগ্বিজয়ে মন দেন। এলাহাবাদে তাঁর সভাকবি হরিষেণ রচিত স্তম্ভলিপি থেকে তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের রুদ্রদেব, চন্দ্রবর্মা, নাগদেব, মতিল প্রভৃতি রাজাদের পরাজিত করেন। এ ছাড়াও পূর্বে সমতট, কামরূপ ও নেপাল রাজ্য জয় করে একচ্ছত্র অধিপতি হন। তিনি দক্ষিণ ভারতের মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, হস্তিবর্মা, বিষ্ণুগোপ ইত্যাদি রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করান। দাক্ষিণাত্য তিনি

বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

নিজরাজ্যভুক্ত করেননি। পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব, আসাম, এমনকি গুজরাটের শক রাজারাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। দিগ্বিজয় শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বহুগুণ-সমন্বিত সম্রাট। তিনি ছিলেন যোদ্ধা, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যানুরাগী। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে তাঁকে "কবিরাজ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু ও কবি হরিষেণ তাঁর রাজসভায় ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত "বিক্রমাদিত্য" উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি নাগবংশীয় কুবের নাগ ও কদম্ববংশীয় ধ্রুবদেবীকে বিয়ে করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়ান। নিজ-কন্যা প্রভাবতীকে তিনি বাকাটক-রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শকদের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করেন। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও মালব দখল করে তিনি রাজ্যসীমা আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। শকদের দমন করার জন্য তাঁকে "শকারি" বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সময় 'স্বর্ণযুগ' বলে চিহ্নিত। তিনি বিদ্যানুরাগী ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে, এই সময় কালিদাস, বরাহমিহির বররুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক ও শঙ্কু নামক বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁর সভায় বিরাজ করতেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ : পরবর্তী গুপ্তসম্রাট হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি সমুদ্রগুপ্তের মত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনিই গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট। ঐ সময় মধ্য এশিয়াবাসীদের ওপর হূনদের

আক্রমণ শুরু হয়। স্কন্দগুপ্ত অমিতবিক্রমে হূন আক্রমণ প্রতিহত করে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। স্কন্দগুপ্তের পর বারংবার হূন আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিদেশীদের আক্রমণে ও গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা ঃ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুরান কথায় আচ্ছন্ন। প্রথমে কয়েকটি কোম ও তাদের কীর্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে প্রাচীন বাংলার উল্লেখ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব-ভারতের অনেক দস্যু কোমের মধ্যে পুণ্ড্র কোমের কথা আছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধের লোকদের অনাচারী বলা হয়েছে। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সমুদ্রতীরবর্তী বাংলার লোকদের "ম্লেচ্ছ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গ ও পুণ্ড্র জনপদগুলিকে আর্য-সভ্যতার বাইরে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলবাসীদের ভাষা 'অসুর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আর্য-ভাষাভাষী আর্য-সভ্যতার বাহকরা সামাজিক নিয়মের তাড়নায়, উর্বর শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে ও আদি কোমগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হয়।

মহাভারত ও পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্রের কথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এদের নাম থেকেই প্রাচীন বাংলার পাঁচটি জনপদের নামের উৎপত্তি হয়েছে। রামায়ণে দেখা যায়, বঙ্গ-দেশের লোকেরা অযোধ্যা-অধিপতির অধীনতা স্বীকার করেছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ ইত্যাদি কোমের সঙ্গে অযোধ্যা-রাজবংশের বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাচীন কোমদের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু সমাজ ও প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী উন্নত অস্ত্রবিদ্যা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার জয় হল। এই কোমগুলো আর্য-সভ্যতার এক পাশে স্থান পেল। বিরোধ ও মিলন চলল শতাব্দীর পর শতাব্দী। মহাভারতের সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে বঙ্গ ও রাঢ় কোমকে আর্য বলা হয়েছে।

প্রাচীন সিংহলী পলিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে বাংলার রাজা সিংহবাহু ও তাঁর পুত্র বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ের কাহিনী উল্লেখ আছে। এই ঘটনা মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে ঘটেছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, ও কলিঙ্গ কোমের লোকেরা প্রায় একই শ্রেণীর ছিল। প্রাচীন বাংলার রাজতন্ত্র মৌর্য আমলের আগে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হয়নি।

গ্রীক ও লাতিন লেখকদের জন্য খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষদিকে বাংলার ইতিহাস কিছুটা জানা যায়। গ্রীক লেখকরা বিপাশা নদীর পূর্বতীরে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাম করেছেন,—পাটলিপুত্র ও গঙ্গা। পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির রচনায় গঙ্গার উল্লেখ আছে। প্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ গ্রন্থ ও মহাস্থানে পাওয়া শিলালিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন ও উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে। বাংলায় কুষাণ আধিপত্যের প্রমাণ নেই।

বস্তুত, গ্রীক-লাতিন লেখকদের কথিত গঙ্গারাষ্ট্র ও মৌর্য আমলের পর থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস অল্পই জানা যায়।

দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের লিপিতে চন্দ্র নামে এক রাজার উল্লেখ আছে, যিনি বাংলার জনপদগুলিতে তাঁর শত্রুদমনের গৌরব দাবি করেছেন। এই চন্দ্র যে কে, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, ইনি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপির চন্দ্রবর্মা। যাই হোক, একথা অনুমান করা যায় যে, চন্দ্রের আক্রমণ পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল।

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি লিপিতে সিংহবর্মাপুত্র পুষ্করণা-অধিপতি চন্দ্রবর্মা নামে এক রাজার খবর পাওয়া যায়। ইনিই বোধ হয় সমসাময়িক রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও তিনি বাংলার প্রায় সব জনপদগুলো গুপ্তরাজ্যভুক্ত করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের আমলেই বাংলা প্রথম গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিং মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজার উল্লেখ করেছেন। ইনি বোধহয় সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহ মহারাজগুপ্ত। এই তথ্য ঠিক হলে বরেন্দ্রভূমি তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত-আধিপত্য স্বীকার করেছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের আমল থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গুপ্তরাজত্বের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। ৫০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোনও এক সময়ে সমতটেও গুপ্ত-অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। এই সময়ে বৈন্যগুপ্ত নামে একজন রাজা ত্রিপুরা জেলায় কিছু ভূমিদান করেছিলেন। তিনি সম্ভবত গুপ্তরাজ্যের সামন্তরাজা হিসেবে পূর্ববাংলায় রাজত্ব করছিলেন।

বিদেশী পরিব্রাজকগণ

মেগাস্থিনিস ঃ সিরিয়ার অধিপতি সেলুকস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজদরবারে মেগাস্থিনিস নামক এক গ্রীক দূত প্রেরণ করেন। তিনি পাটলিপুত্রে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। মেগাস্থিনিস তাঁর অভিজ্ঞতা "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মৌর্য আমলের শাসন-পদ্ধতি ও সমাজ সম্পর্কে এক বিস্তৃত বিবরণ তাঁর বর্ণনায় পাওয়া পায়।

মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ঐ সময় ভারতে অনেক ছোটবড় রাজ্য থাকলেও মগধ শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিল। মগধের প্রায় ছ'লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও ন' হাজার হাতি ও বিরাট নৌবাহিনী ছিল। তাঁর বিবরণে পাটলিপুত্রের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে এই নগর দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল ও প্রস্থে দু' মাইল ছিল। শত্রুর আক্রমণ রোধের জন্য নগরের চারদিক পরিখা ও কাঠের প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। তিনি মৌর্য রাজপ্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা করেন। রাজপ্রাসাদের নাম ছিল সুসঙ্গেয়। প্রাসাদটি ছিল কারুকার্যখচিত কাঠের তৈরী। প্রাসাদের চারদিকে বাগান ও পুকুর ছিল। রাজার জীবনযাত্রা, আড়ম্বর, রাজসভার ঐশ্বর্য, আমোদ-প্রমোদের তিনি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন বহু শ্রেণীর কর্মচারী রাজ্যশাসনে নিযুক্ত ছিলেন। নগর-পরিচালনার জন্য একটি নগর-পরিষদ গঠিত হত। এই পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ছিল ত্রিশ। এই ত্রিশ জন আবার দু'টি ক্ষুদ্র পরিষদে বিভক্ত ছিল। এক এক বিভাগের এক একটি দায়িত্ব থাকত।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে সেই সময়ের সমাজ-জীবন সম্পর্কেও জানা যায়। তিনি ভারতীয়দের চরিত্রের খুব প্রশংসা করেছেন। দেশে প্রাচুর্য থাকায় চুরি-ডাকাতি হত না। পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় ও সরল বলে তিনি ভারতীয়দের সুখ্যাতি করেছেন। তাঁর মতে তখন আপসে সব বিরোধের মীমাংসা হত। মেগাস্থিনিস সমাজের অধিবাসীদের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—অমাত্য, গুপ্তচর, কারিগর, কৃষক, সেনা, পশুপালক ও দার্শনিক। ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় তিনি বৃত্তি অনুযায়ী ভাগ করেছেন। তাঁর মতে তখন ভারতে দাস-প্রথা ছিল না। তিনি বলেছেন, কৃষি ও পশুপালন ভারতীয়দের প্রধান জীবিকা ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজ-কর হিসেবে দিতে হত। এ ছাড়াও জন্ম-কর, মৃত্যু-কর, বিক্রয়-কর ইত্যাদি দিতে হত। দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না। জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। মেগাস্থিনিস ভারতীয় শিল্পকলারও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন সমাজে মহিলারাও সুশিক্ষিত ছিলেন। একদল মহিলা-সৈন্য সম্রাটের দেহরক্ষী কাজ করতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

ফা-হিয়েনের বিবরণঃ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অনেক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফা-হিয়েন। তিনি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে আসেন। দশ বছর ধরে তিনি বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র যথা, মথুরা, কনৌজ, বারাণসী, কপিলাবস্তু, বৈশালী, পাটলিপুত্র, পেশোয়ার প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

সেই সময়ের সামাজিক বর্ণনায় ফা-হিয়েন বলেছেন, জনসাধারণ উন্নত ও আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করত। একমাত্র চণ্ডাল ছাড়া কেউ মদ ও মাংস খেত না। চুরি-ডাকাতির কোনও ভয় ছিল না ও লোকে দরজা-জানালা খুলেই ঘুমোত। ভারতীয়দের আচরণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সমাজে চণ্ডালরা অস্পৃশ্য জাতি বলে পরিচিত ছিল। তারাই শুধু পশুবধ করত। নগরে তারা প্রবেশ করত না, নগরের বাইরে বাস করত। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিন বছর পাটলিপুত্রে বাস করেন। পাটলিপুত্র নগরের অধিবাসীদের স্বচ্ছন্দ জীবন ও দানশীলতার তিনি ভূয়সী

প্রশংসা করেছেন। পাটুলিপুত্রে দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনাথ-আশ্রম ছিল। ফা-হিয়েন ভারতে ধর্মীয় উদারতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও অপর ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, বাংলা ও পাঞ্জাবে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম পালন করতেন। তিনি বাংলা দেশের তাম্রলিপ্তকে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বণিকরা তাঁদের পসরা নিয়ে এই বন্দর থেকে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। তিনি মথুরা শহরে অনেক বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেছেন।

ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সমাজে বিদেশী সম্পর্কের প্রভাব :
সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ দুর্বল হয়ে পড়েন; সেই সুযোগে ব্যাকৃট্রিয় গ্রীক, পার্থীয় সীথিয়, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোক উত্তর-পশ্চিম পথে ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন অংশে রাজ্য স্থাপন করে। এদের সবারই আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায়।

ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে একটি বিষয় ধারাবাহিক ভাবে চলছিল—তা হল ব্যবসা। শুঙ্গ, সাতবাহন, ইন্দো-গ্রীক, শক, কুষাণ রাজত্বকালে ব্যবসায়ীরা ক্রমেই শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। বিদেশীরা উত্তর-পশ্চিম ভারত দখল করলে ব্যবসায়ীদের আরও সুবিধে হয়। এর ফলে ব্যবসার জন্য নতুন নতুন স্থান উন্মুক্ত হল। শক, পার্থিয়ান, কুষাণরা মধ্য এশিয়াকে ব্যবসায়ীদের আওতার মধ্যে এনে দিল। এর ফলে চীনের সঙ্গে ব্যবসার সুবিধে হল।

এই সময় ব্যবসায়ীরা নানা সংঘ স্থাপন করে। প্রচুর কারিগর এইসব সংঘে যোগ দেয়। বিদেশী বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা জিনিসের উৎপাদন বেড়ে যায়। ভাড়া-করা শ্রমিক ও দাসদের নিয়োগ করা হয়। মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প ও কাষ্ঠশিল্পের সংঘগুলিই ছিল প্রধান। ক্রমাগত ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে বিনিময়-ব্যবস্থার পরিবর্তে মুদ্রা-ব্যবস্থার সূত্রপাত হল। মৌর্যযুগের পর মুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে জোয়ার এল। উত্তর-পশ্চিম

ভারতের রাজারা গ্রীক ও পারসিক মুদ্রার নকল করে মুদ্রা তৈরি করলেন। রোমান মুদ্রা "দিনার-ও" স্বাভাবিক ভাবে চলত। রোম যখন পশ্চিম এশিয়া ও নিকটস্থ আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো জয় করে, তখন ভারতবর্ষ থেকে নানা পণ্যদ্রব্য রোমক সাম্রাজ্যে চালান যেত। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দর থেকে মাল-বোঝাই জাহাজ লোহিত সাগর পর্যন্ত যেত। সেখান থেকে মালগুলো উটের পিঠে বোঝাই হয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হত, এবং পরে রোমে পাঠানো হত। ভারত থেকে রেশম, মসলিন, কাপড়, হাতির দাঁত, মসলা, নানা গন্ধদ্রব্য রপ্তানি করা হত। আর বিদেশ থেকে তামা, টিন, প্রবাল, কাচ, রূপোর জিনিস ইত্যাদি আমদানি করা হত। উত্তর ভারতের তক্ষশীলা ছিল রোমান বাণিজ্যের যোগাযোগ-কেন্দ্র। তক্ষশীলায় তখন ইরান, আফগানিস্তান ও চীন থেকে নানা জিনিস এসে জমা হত। চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে রেশম ভারতে আসত বলে ঐ রাস্তাকে "রেশমের রাস্তা" বা "সিল্ক রুট্" বলা হয়।

উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে তাদের চিন্তাধারা ভারতে প্রবেশ করে ও ভারতের চিন্তাধারা মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও আদান-প্রদান হতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিল্পে এই প্রভাব অপরিসীম। গ্রীক ও রোমান শব্দ ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ করল। গ্রীকরা ভারতীয় ভাষার সঙ্গে গ্রীক ভাষারও ব্যবহার করত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক ভাষায় অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। অনেকে বলেন, গ্রীকদের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি হয়। ভারতীয় লোক-গাথাও পশ্চিমের সাহিত্যে স্থান পায়। এই সম্পর্কের ফলে স্ট্রাবোর ভূগোল, এ্যারিয়ানের ইণ্ডিকা, প্লিনির প্রাকৃতিক ইতিহাস, নাবিক পেরিপ্লাসের বিবরণী ও টলেমির ভূগোলে ভারতের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায় শিল্পের ক্ষেত্রে। ভারতীয় ও গ্রীক যুক্তপ্রবাহে গড়ে ওঠে গান্ধার-শিল্প। এই গান্ধার-শিল্প ভারত ও আফগানিস্তানে বিস্তার লাভ করে।

হিন্দুধর্মে জাতিভেদ ব্যবস্থা থাকায় বিদেশীরা ভারতে এসে বৌদ্ধধর্ম
গ্রহণ করে ও ভারতের সমাজব্যবস্থায় মিশে যায়। ভারতীয় সমাজের
ব্রাহ্মণশ্রেণী এই নতুন শাসকদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের "পতিত ক্ষত্রিয়"
বলে উল্লেখ করে সমাজে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখেন। কিছু নীচুশ্রেণীর
লোক এই সুযোগে বিদেশীদের সঙ্গে মিশে নিজেদের উন্নতশ্রেণীর বলে
পরিচয় দিতে শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর
কারিগর কাজ পায়। এই কারিগরেরা বেশির ভাগই ছিল শূদ্র জাতের;
কিন্তু পেশা ও স্থান পরিবর্তন করে তারা তাদের জাতের উন্নতি
করে।

উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতির সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্ম
সম্পর্কে নতুন চিন্তা শুরু হল। একদল বুদ্ধদেবকে দেবতার মত দেখতে
আরম্ভ করলেন। বুদ্ধমূর্তি-পূজো প্রচলিত হল। এরই ফলে বৌদ্ধ-ধর্মমত
"মহাযান" ও "হীনযান" এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যাঁরা বৌদ্ধধর্মের
আদি নীতিগুলো মেনে চলতেন, তাঁদের বলা হয় মহাযান ও যাঁরা
বুদ্ধদেবকে দেবতার মত পূজো করতেন, তাঁদের বলা হয় হীনযান
বৌদ্ধ।

হিন্দুধর্মের অনেক পরিবর্তন হল। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও দেবতাদের
ওপর বিধর্মীদের ক্রমাগত আক্রমণে উপনিষদ-কথিত এক ঈশ্বরবাদের উদ্ভব
হল। এই সময়ে বলা হল ব্রহ্মা স্রষ্টা, বিষ্ণু রক্ষক ও শিব পৃথিবীর
অনাচারে ধ্বংসকারী। এই তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের উপাসকের
সংখ্যা বেড়ে গেল ও শৈব এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল।

**ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে প্রাচীন
ভারতবর্ষের অগ্রগতি ঃ** প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্যে, শিল্প ও
স্থাপত্যে, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছিল।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ আদি আর্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত সব থেকে
প্রাচীন সাহিত্য বেদ, ব্রাহ্মণগুলি ও উপনিষদসমূহ সংস্কৃত ভাষায় ছিল।
এগুলি লিখিত ছিল না, —মুখে মুখে প্রচারিত হত। এই সংস্কৃত ভাষাই
পরিবর্তিত হয়ে আজকের সংস্কৃতে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতের সঙ্গে আরও

কয়েকটি ভাষার সৃষ্টি হয়, যাদের প্রাকৃত বলা হয়। সেইসব ভাষা উচ্চারণে ও ব্যাকরণে অনেক সহজ। পালি, মাগধী, সুরসেনী ভাষাগুলো প্রাকৃত ভাষাগুলোর বিভিন্ন রূপ, —যা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হত।

ব্রাহ্মীলিপি

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পর প্রাকৃত ভাষাগুলোর পরিবর্তন হয়। মৌর্যযুগে শাসনের কাজে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হত। অশোক তাঁর শিলালিপিতে ব্রাহ্মী ও খরষ্ঠীলিপি ব্যবহার করেছেন। এই ব্রাহ্মীলিপিকে আশ্রয় করেই ভারতের বেশির ভাগ লিপি তৈরি হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লোকগাথা থেকে মহাভারত ও রামায়ণ রচিত।

বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির ব্যাকরণসৃষ্টির পর থেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ভাষায় পরিণত হয়। বেশির ভাগ বৌদ্ধ সাহিত্য পালি ভাষায় লেখা। গুপ্তযুগের সময় থেকে প্রায় সব ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সংস্কৃতে লেখা হয়। এই সময় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরম গৌরবময় যুগ। মহাকবি কালিদাসের "রঘুবংশম্" ও "কুমারসম্ভবম্" প্রভৃতি কাব্য, ভবভূতির "উত্তররামচরিত" নাটক, শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক" নাটক, বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস" নাটক, গুপ্তযুগের অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি।

বিজ্ঞান ঃ প্রাচীন যুগে বহু শাস্ত্র লেখা হয়েছিল। শাস্ত্রগুলি ঔষধ, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ নিয়ে লেখা। এই শাস্ত্রগুলো লেখা হয়েছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য। কিন্তু এই শাস্ত্রগুলিই বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করল।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌রা বিশ্বচরাচরকে চার বা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই চিন্তাবিদ্‌রা বলতেন প্রতিটি জিনিস 'অণুর' গঠনের দ্বারা তৈরি। 'অণুর' ওপর জিনিসের তারতম্য নির্ভর করে। যাগযজ্ঞের বিশেষ দিনক্ষণের জন্য জ্যোতিষবিদ্যার শুরু হয়। এর হাজার বছর পর দিনের সময়, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ নির্ণয়ের সঠিক পন্থা আবিষ্কৃত হল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট ও বরাহমিহির প্রাচীনযুগের দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। এঁরা দুজনেই গুপ্তযুগের লোক। উজ্জয়িনীর পণ্ডিত আর্যভট্ট মাত্র তেইশ বছর বয়সে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করেন। আর্যভট্টই শূন্য সংখ্যা ও দশমিক ভগ্নাংশের আবিষ্কর্তা। বেদে অঙ্কশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। বৈদিক দেবতার উঁচু আসন তৈরি থেকে জ্যামিতির উদ্ভব হয়। ক্রমে অঙ্কশাস্ত্র আরও উন্নত হয়।

প্রাচীনকালে চিকিৎসাশাস্ত্রও উন্নত ছিল। কুষাণ রাজা কনিষ্কের আমলে বিখ্যাত সুশ্রুত ও চরক তাঁদের চিকিৎসাশাস্ত্র ও সংহিতা রচনা করেন। গুপ্তযুগে ধন্বন্তরী নামে একজন বৈদ্য ভারতীয় লতা-পাতা থেকে অনেক নির্যাস তৈরি করেন ও লোহা, তামা, পারদ প্রভৃতি ধাতুকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করেন। অস্ত্রচিকিৎসায় ভারতীয় বৈদ্যরা নিপুণ ছিলেন। মোমের পুতুল তৈরি করে তাঁরা অস্ত্রচিকিৎসা অভ্যাস করতেন। গ্রীক ও আরবরা আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে অনেক বিষয় শিখেছেন।

শিক্ষা ঃ বৈদিক যুগে শিক্ষা গুরুগৃহে হত। পরিবর্তিকালে ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধমঠে শিক্ষা দেওয়া হত। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রকে ৩০ থেকে ৩৭ বছর শিক্ষা নিতে হত। বৌদ্ধ মঠে শিক্ষা দেওয়া হত প্রায় ১০ বছর ধরে ও যারা সন্ন্যাস নিত, তাদের আরও বেশী দিন থাকতে হত। পাটনার কাছে নালন্দা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে তক্ষশীলায় বিখ্যাত শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে। এইসব শিক্ষায়তনে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে নানা মন্দির ও মঠ আবিষ্কৃত হয়েছে।

শিল্প ও স্থাপত্য ঃ হরপ্পার সংস্কৃতির ধ্বংসের পর ভারতে প্রায়

অজন্তার গুহা (অভ্যন্তর)

এক হাজার বছর শিল্প ও স্থাপত্যের কোনও উন্নতি হয়নি। হরপ্পার অধিবাসীদের কথা সবাই ভুলে যায়। বৈদিক যুগে পরিকল্পিত ভাবে গৃহ বা শহর তৈরি করা হয়নি। ভাস্কর্যের বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগের মৃৎশিল্পেও শিল্পসৌন্দর্য ছিল না।

৪র্থ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের শেষদিকে মৌর্য রাজত্বে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন জাগরণ আসে। অশোকের নির্মিত গৃহ ও স্তূপগুলি এবং পরবর্তিকালের চৈত্য ও বিহারগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্যের বিশেষ নিদর্শন। অশোকস্তম্ভগুলি তৎকালীন স্থাপত্যের বিশেষ চিহ্ন। বুদ্ধের নিদর্শন রাখার জন্য যে স্তূপগুলি সৃষ্টি হয় সেগুলিও সুন্দর শিল্পের চিহ্ন। স্তূপগুলির প্রবেশদ্বার ও রেলিংগুলি ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। চৈত্যগুলি সৃষ্টি হয় বৌদ্ধশিল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই সময় পাথর ছিদ্র করে ও কেটে এবং দেওয়ালে চিত্র এঁকে শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

মৌর্যযুগের পর গান্ধার ও মথুরা শিল্পের সৃষ্টি হয়। গান্ধারশিল্পে গ্রীক ও রোমান প্রভাব সুস্পষ্ট, মথুরাশিল্প সম্পূর্ণ দেশীয়। দু'টি শিল্পই বৌদ্ধধর্ম

অজন্তার গুহাচিত্র—মা ও ছেলে

বিষয়ে রচনা। অমরাবতীতে একটি বিখ্যাত স্তূপ নির্মিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ একটি বিশিষ্ট কাল। গুপ্তযুগে অঙ্কনশিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি এইসময় আঁকা হয়েছিল।

গর্ভগৃহ সমেত হিন্দুমন্দির নির্মাণ-রীতিও এই সময় আরম্ভ হয়। মন্দির-গুলো সাধারণতঃ পাথরের তৈরি হত ও একটি কক্ষ থাকত যাতে দেবতার মূর্তি স্থাপিত হত। বর্তমান বারাণসী শহরের কাছে সারনাথের বুদ্ধমূর্তি গুপ্তযুগের ভাস্কর্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

———

প্রশ্নাবলী

বৈদিক যুগ

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) আর্য কাদের বলা হত? কখন ও কোথা থেকে তারা ভারতে এসেছিল?
(খ) বৈদিক যুগের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।
(গ) আর্যদের সামাজিক জীবন ও ধর্ম কি রকম ছিল?
(ঘ) বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বোঝ?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) বেদ ক'ভাগে বিভক্ত? বিভিন্ন বেদ কি উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল?
(খ) আর্য সমাজে নারীদের স্থান সম্পর্কে যা জান লেখ।
(গ) আর্যরা ভারতে কোথায় প্রথমে বসতি স্থাপন করে?
(ঘ) পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বোঝ?
(ঙ) রামায়ণ ও মহাভারতের কালে আর্যদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?
(চ) আর্যসমাজে "চতুরাশ্রম" সম্পর্কে যা জান লেখ।
(ছ) আর্যসমাজে বর্ণভেদ-প্রথা কিভাবে প্রচলিত হয়?

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) মহাবীর কে ছিলেন? তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম কি? এই ধর্মের মূল নীতি কি ছিল?
(খ) বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের নাম কি? এই ধর্মের মূলমন্ত্র কি ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম কি? কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল? তাঁর পিতা-মাতার নাম কি ছিল?
(খ) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির কারণ কি?
(গ) মহাবীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? দিব্যজ্ঞান লাভের আগে তাঁর জীবন সম্পর্কে যা জান লেখ।
(ঘ) "মহানিষ্ক্রমণ" বলতে কি বোঝ? বুদ্ধদেবের এই নিষ্ক্রমণের পূর্বের জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(ঙ) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।
(চ) অষ্টমার্গ কি? এই মার্গগুলিতে কি বলা হয়েছে?
(ছ) "নির্বাণ" বলতে কি বোঝ? বুদ্ধদেব কেন নির্বাণের কথা বলেছিলেন?

সাম্রাজ্যসমূহ

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের রাজাদের সম্পর্কে যা জান লেখ।
(খ) সম্রাট অশোককে মহামতি বলা হয় কেন?
(গ) মৌর্য শাসনের পর ভারতে যে বিদেশীরা রাজত্ব করেন তাঁদের বিবরণ দাও।
(ঘ) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।
(ঙ) গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দাও।
(চ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।

(খ) মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ? কোন্ যুদ্ধের পর ও কেন তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন হয় ?

(গ) সম্রাট অশোকের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও ধর্মপ্রচার বিষয়ে যা জান লেখ।

(ঘ) কুষাণ কারা ?

(ঙ) কনিষ্কের শাসন-প্রণালী ও ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(চ) সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত অভিযান সম্পর্কে যা জান লেখ।

(ছ) গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এই বংশের প্রথম রাজা সম্পর্কে যা জান লেখ।

(জ) হরিষেণ কে ছিলেন ও কিজন্য বিখ্যাত হয়েছেন ?

(ঝ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেছিলেন ?

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বর্ণনা কর।

ঘ। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোন্ সূত্র থেকে আমরা বাংলার ইতিহাস জানতে পারি ?

(খ) আদি বৈদিক সাহিত্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে ?

(গ) কিভাবে ও কেন বাংলাদেশে আর্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করে ?

(ঘ) গ্রীক ও লাতিন লেখকদের কাছ থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস কি জানতে পারা যায় ?

(ঙ) গুপ্তযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে যা জান লেখ।

(চ) চন্দ্রবর্ম কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।

বিদেশী সম্পর্ক

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় ?

(খ) বিদেশী সম্পর্কের ফলে ভারতের শিল্প ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন হয় তার বর্ণনা দাও।

(গ) বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ধর্মে কি পরিবর্তন হয় ?

২। **সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে কোন্ সম্প্রদায় লাভবান হয় ?

(খ) বিদেশীদের সম্পর্ক কিভাবে ব্যবসায়ী-সংঘ গঠনে সাহায্য করে ?

(গ) ভারতের সঙ্গে রোমান বাণিজ্য কিভাবে হত ?

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান কিভাবে হত ?

(ঙ) বিদেশীরা বৌদ্ধধর্ম কেন গ্রহণ করত ? সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কি হ'ল ?

(চ) গান্ধার-শিল্প কি ? কিভাবে ও কোন্ অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে ওঠে ?

(ছ) বিদেশী সম্পর্কের ফলে হিন্দুধর্মের কি পরিবর্তন হল ?

বিদেশী পরিব্রাজকবৃন্দ

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী তৎকালীন সমাজের বর্ণনা দাও।
(খ) ফা-হিয়েনের বিবরণ সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) মেগাস্থিনিস কে? তিনি কার রাজত্বকালে ও কার দূত হয়ে ভারতে আসেন?
(খ) মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের কি বিবরণ দিয়েছেন?
(গ) মেগাস্থিনিসের বিবরণে সেই সময়ের সমাজ সম্পর্কে কি জানা যায়?
(ঘ) ফা-হিয়েন কোন্ রাজার রাজত্বকালে ভারতে আসেন? তিনি কতদিন ভারতে থাকেন ও কোন্ কোন্ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন?
(ঙ) ফা-হিয়েনের বিবরণে তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে কি জানা যায়?
(চ) ফা-হিয়েন সেই সময়ের ধর্ম সম্পর্কে কি বলেছেন?

প্রাচীন ভারতের ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-স্থাপত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রাচীন ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লেখ।
(খ) প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে যা জান লেখ।
(গ) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও শিক্ষায় অগ্রগতির বিবরণ দাও।

২। সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ঘ) আর্যদের আদি ভাষা কি ছিল? তার সম্পর্কে আলোচনা কর।
(খ) প্রাকৃত ভাষা কি? এই ভাষা কি কাজে ব্যবহার হত?
(গ) অশোক তাঁর শিলালিপিতে কোন্ ভাষা ব্যবহার করেছেন? ব্রাহ্মীলিপির গুরুত্ব কি?
(ঘ) প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে গুপ্তযুগের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।
(ঙ) স্থাপত্য ও শিল্পে বৈদিক আর্যদের দান কি?
(চ) শিল্পে ও স্থাপত্যে কখন জাগরণ আসে? মৌর্যযুগে শিল্পে ও স্থাপত্যে কতটুকু উন্নতি হয়?
(ছ) শিল্পে ও স্থাপত্যে গুপ্তযুগের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।
(জ) প্রাচীন কালে ভারতের বিজ্ঞানসাধনা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(ঝ) আর্যভট্ট ও বরাহমিহির কোন্ যুগের বিজ্ঞানী? তাঁদের সম্পর্কে কি জান?
(ঞ) প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ।

পরিশিষ্ট

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ইতিহাস — অগ্রগতির বিবরণ।
(খ) অতীতের ঘটনার ফলেই — সৃষ্টি।
(গ) ইতিহাস আজকাল আর শুধু — ইতিহাস নয়।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে √ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) ইতিহাস-পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক জানতে পারি।
(খ) ইতিহাস আজকাল শুধু রাজাদের ইতিহাস।
(গ) ইতিহাস আজ মানুষের সভ্যতার ও তার অগ্রগতির বিবরণ।
(ঘ) ইতিহাস না পড়লে আমরা জ্ঞানের দিক থেকে অসম্পূর্ণ থেকে যাব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) এই পৃথিবীর জন্ম হয় কবে?
(খ) মানুষের জন্ম হয় কত বছর আগে?
(গ) ব্যাবিলনের বর্তমান নাম কি?
(ঘ) সিন্ধু অঞ্চলের কোথায় প্রাচীন যুগের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে?
(ঙ) মিশরের কোন্ পাথরের গায়ে প্রাচীন রাজাদের কাহিনী লেখা আছে?
(চ) খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
(ছ) বেদ কাদের ধর্মগ্রন্থ?
(জ) গ্রীকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
(ঝ) রোমান কবি ভার্জিলের রচিত গ্রন্থের নাম কি?
(ঞ) আমাদের দেশে কোন্ রাজা শিলালিপিতে তাঁর কীর্তিকাহিনী লিখে রেখেছেন?

৪। বাক্যাংশগুলি সঠিকভাবে সাজাও :

(ক) নানা জায়গায় প্রাচীন যুগের	(ক) ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে পারা যায়।
(খ) কোন্ কোন্ মুদ্রার ওপর	(খ) অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।
(গ) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাওয়া মুদ্রা থেকে	(গ) দেবদেবীর মূর্তি আঁকা আছে।
(ঘ) গ্রীক কবি হোমারের রচিত	(ঘ) শক, কুষাণ, ব্যাকট্রিয়ান, গ্রীক জাতির ইতিহাস রচনা করা হয়েছে।
(ঙ) রোমান কবি ভার্জিলের রচিত	(ঙ) ইনিড থেকে প্রাচীন রোমের ইতিহাস জানতে পারা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) মানব-সভ্যতার ইতিহাস আমরা কিসের সাহায্যে জানতে পারি ?
(খ) কত বছর আগে মানুষ হাতিয়ার তৈরির কাজ শুরু করে ?
(গ) কয়টি নির্দিষ্ট বরফের যুগ এসেছিল ?
(ঘ) আদিম যুগের মানুষ কখন উন্নতি লাভ করে ?
(ঙ) এশিয়ার আদি মানবের প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায় কোথায় ?
(চ) কে আদি মানবের মাথার খুলি আবিষ্কার করেন ?
(ছ) কোথায় প্রথম আদি মানবের মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয় ?

২। বাক্যগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(ক) আধুনিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে হোমিনি ও শ মনুষ্য জাতীয় প্রাণীর প্রথম	(ক) প্রায় পাঁচশো হাজার বছর আগে।
(খ) মানুষের হাতিয়ার তৈরি শুরু হয়েছে	(খ) কিছুটা গরমকাল।
(গ) দুইটি বরফের যুগের মধ্যে ছিল	(গ) পাওয়া গিয়েছে জাভায়।
(ঘ) এশিয়ার আদি মানবের প্রথম চিহ্ন গুহায় আদি মানবের মাথার খুলি আবিষ্কার করেন	(ঘ) চাও-কাও-টিয়েন নামক পর্বত।
(ঙ) চীনা পণ্ডিত ডবলিও সি. পেই চীনের পিকিং শহরের কাছে	(ঙ) আবির্ভাব হয়েছে আফ্রিকার প্রথম বরফের যুগে।
(চ) ঐতিহাসিকরা মাথার খুলি দেখে অনুমান করেছেন	(চ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫,০০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ বছর আগে মানুষ বাস করত।
(ছ) ইউরোপে আদিম যুগের মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে	(ছ) জার্মানীর হাইডেল্‌বার্গ শহরের কাছে।
(জ) আগুন আদিম মানুষকে দিল	(জ) আলো, তাপ ও হিংস্র জানোয়ার থেকে বাঁচার উপায়।
(ঝ) আদিম যুগের মানুষ ছিল	(ঝ) খাদ্য-সংগ্রাহক।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও।

(ক) আদিম যুগের মানুষ আগুন জ্বালতে জানত।
(খ) আদিম যুগের মানুষ শিকার করত না।
(গ) আদিম যুগের মানুষ শস্য জন্মাতে জানত।
(ঘ) আদিম যুগের মানুষ কাঁচা মাংস খেত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। বাক্যাংশগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ শুধু
(খ) হাত-কুড়ুল হাতের মুঠোয় ধরে
(গ) কাটারির মত অস্ত্র দিয়ে

(ক) বোধ হয় মাংস কাটা হত।
(খ) কিছু কাটা বা জোরে ঘা দেবার জন্য ব্যবহার করা হত।
(গ) রুক্ষ পাথরের অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) কোন্ জন্তু প্রথম মানুষের পোষ মানে ?
(খ) সবশেষে কোন্ জন্তুকে পোষ মানানো হয় ?
(গ) 'টোটেন' বলতে কি বুঝ ?
(ঘ) 'মাতৃদেবতা' কাকে বলা হয় ?
(ঙ) কত খ্রীঃ পূঃ সিন্ধু-সভ্যতায় তুলোর উৎপাদন হত ?
(চ) নব্য প্রস্তর যুগের একটি বিশিষ্ট অস্ত্রের নাম কি ?
(ছ) নব্য প্রস্তর যুগের বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে কোথায় ?
(জ) কিসের অধিকার এই প্রস্তর যুগের মানুষকে স্থায়িভাবে বসতিস্থাপনে সাহায্য করে ?
(ঝ) নব্য প্রস্তর যুগে পরিবহণের জন্য কি ব্যবহার করা হত ?
(ঞ) সমাজে কাকে সবাই মানত ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। (ক) — প্রথম মানুষের পোষ মানে।
(খ) — সব শেষে মানুষের পোষ মানে।
২। (ক) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ — বিশ্বাস করত।
(খ) — খ্রীঃ পূঃ সিন্ধু-সভ্যতায় তুলোর উৎপাদন হয়।
(গ) নব্য প্রস্তর যুগের একটি বিশিষ্ট অস্ত্রের নাম হচ্ছে —।
(ঘ) নব্য প্রস্তর যুগে — শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে।
(ঙ) — মানুষের স্থায়ী বসতিস্থাপনে সাহায্য করল।
(চ) — ও — সাহায্যে বাড়ী তৈরির জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত।
(ছ) দামী পাথর ও সামুদ্রিক শাঁখের অনেক চিহ্ন — ও মিশরে — পাওয়া গেছে।
(জ) নব্য প্রস্তর যুগের সমাজে সবাই মান্য করত — কে ?
(ঝ) নব্য প্রস্তর যুগের শিল্প ছিল পুরাতন প্রস্তর যুগের মত — ও আশার প্রতিচ্ছবি।

৩। বাক্যাংশগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(ক) প্রথম জন্তু বা মানুষের সঙ্গী হয়	(ক) স্থায়ী বসতিস্থাপনে সাহায্য করল।
(খ) সব শেষ যে জন্তু পোষ মানানো হয়	(খ) যৌথভাবে ছোট ছোট গ্রাম বা জনপদে বাস করত।
(গ) তুলো ও পশমের বোনা কাপড়	(গ) তা হচ্ছে কুকুর।
(ঘ) নব্য প্রস্তর যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষরা	(ঘ) চামড়া ও গাছের পাতার আচ্ছাদনে স্থান নেয়।
(ঙ) কৃষিকাজই মানুষের	(ঙ) তা হচ্ছে অশ্ব।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষা ও পশুশিকারের জন্য ব্যবহার করত।

(খ) পোড়ামাটির পাত্র আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে না।

(গ) কৃষিকাজের জন্যই মানুষ স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন।

(ঘ) নব্য প্রস্তর যুগে মানুষকে কবর দেওয়া হত না।

(ঙ) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ ভাষার ব্যবহার জানত না।

(চ) পশ্চিম এশিয়ার নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শনের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় অধ্যায়

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) প্রথমে কোন্ ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়?

(খ) সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার দেখা যায় কোথায়?

(গ) কত খ্রীঃ পূঃ প্রথম তামার ব্যবহার আরম্ভ হয়?

(ঘ) প্রথমে মানুষ কোথা থেকে তামা সংগ্রহ করত?

(ঙ) টিন দস্তার সংমিশ্রণে যে ধাতু তৈরি হত, তাকে কি বলে?

(চ) প্রথম চাকার গাড়ীর ব্যবহার দেখা যায় কোথায়?

(ছ) আনুমানিক কত হাজার বছর আগে গাধাকে ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করা হত?

(জ) প্রায় চার হাজার খ্রীঃ পূঃ ঘোড়ার হাড় পাওয়া গেছে কোথায়?

(ঝ) সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে কি কি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?

(ঞ) রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়?

(ট) 'ইসাক' বা 'রাজা' কাদের বলা হত?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) সভ্যতার বড় বিশেষত্ব —।

(খ) প্রথম যে ধাতু আবিষ্কার ও হাতিয়ার তৈরির কাজে লাগে, তা হল —

(গ) সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার দেখা যায় — ও — খ্রীঃ পূঃ।

(ঘ) — ও — সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়।
(ঙ) টিন ও দস্তার সংমিশ্রণে যে ধাতু তৈরি হয়, তাকে — বলে।
(চ) মিশ্রিত ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় — যুগ।
(ছ) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দেখা দিল —।
(জ) 'ইসাক' বা 'রাজা' — বলা হত —।
(ঝ) সভ্যতার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — ও —।
(ঞ) সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে —।
(ট) সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে — ও — মেসোপোটেমিয়ায়।
(ঠ) নীল নদের কাছে —।
(ড) সিন্ধু নদের তীরে —।
(ঢ) চীনের — ও — নদীর উপত্যকায়।
(ণ) সামরিক আয়োজনের ভার থাকত — বা —।
(ত) যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারটা সর্দারদের — হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :
(ক) মেসোপোটেমিয়া কথার অর্থ কি ?
(খ) মেসোপোটেমিয়া কোন্ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ?
(গ) সুমের বলতে কোন্ অঞ্চলকে বোঝায় ?
(ঘ) ব্যাবিলন ও আক্কাদ কোন্ অঞ্চলকে বলা হত ?
(ঙ) এ্যাসিরিয়া কোন্ অঞ্চলকে বলা হত ?
(চ) সর্বপ্রথম পৃথিবীতে সভ্যতার উন্মেষ কোথায় হয় ?
(ছ) আনুমানিক কত খ্রীঃ পূঃ সুমের সভ্যতা উন্মেষের চরম পর্যায়ে পৌছায় ?
(জ) মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার ভিত্তি কি ছিল ?
(ঝ) মেসোপোটেমিয়ার জমি কখন উর্বর হত ?
(ঞ) ধাতু আবিষ্কারের আগে মেসোপোটেমিয়ান্‌রা কিসের তৈরী কাস্তে ব্যবহার করত ?
(ট) মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীরা কিসের পোশাক পরত ?
(ঠ) মেসোপোটেমিয়ার প্রতিটি শহর কয় ভাগে বিভক্ত ছিল ?
(ড) মেসোপোটেমিয়া শহরের প্রধান মন্দিরকে কি বলা হত ?
(ঢ) মেসোপোটেমিয়ার সমৃদ্ধি সাধারণত নির্ভর করত কিসের ওপর ?
(ণ) মেসোপোটেমিয়ায় প্রথম লেখার অক্ষর সৃষ্টি হয় কোথায় ?
(ত) মেসোপোটেমিয়ান্‌দের প্রথম লেখার:অক্ষর কি রকম ছিল ?
(থ) সুমেরীয়দের আবিষ্কৃত লেখনীকে কি বলা হত ?
(দ) মৃৎ-শিল্পীর চাকা কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হয় বলে অনুমান করা হয় ?
(ধ) মেসোপোটেমিয়ান্‌দের সমাজে মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত ছিল কারা ?

২। সঠিক উত্তরে দাগ দাও :

(ক) প্রাচীন মিশরীয়রা নিম্নলিখিত জন্তুগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ জাবজন্তুকে দেবতা-জ্ঞানে পূজো করত—
গরু, শূকর, শকুন, অশ্ব, কুমীর, ষাঁড়, ইত্যাদি।

(খ) মিশরীয়দের প্রধান শস্য ছিল—
গম, যব, জোয়ার, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

৩। বাক্যাংশগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(ক) মেসোপোটেমিয়া কথার অর্থ	(ক) ব্যাবিলন ও অক্কাদ।
(খ) সুমেরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে বলত	(খ) দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।
(গ) পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার	(গ) ৫২৬ খ্রীঃ পূঃ সেই অঞ্চল সভ্য ছিল।
(ঘ) ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ সুমেরীয় সভ্যতা	(ঘ) উন্মেষ হয় মেসোপোটেমিয়ায়।
(ঙ) মেসোপোটেমিয়ার প্রতিটি ছোট শহর ছিল।	(ঙ) উন্মেষের চরম পর্যায়ে পৌছায়।
(চ) মেসোপোটেমিয়ার নিপ্পুর অঞ্চলের নিদর্শন থেকে মনে হয়	(চ) এক একটি ছোট রাজ্যের রাজধানী।
(ছ) মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার	(ছ) সুমেরীয় সভ্যতার বড় অবদান।
(জ) খালের মাধ্যমে জল আনার ব্যবস্থা	(জ) ভিত্তি ছিল জমি।
(ঝ) মেসোপোটেমিয়ান্‌দের প্রধান জীবিকা ছিল	(ঝ) পোড়ামাটির কাস্তে ব্যবহার করত।
(ঞ) ধাতুর আবিষ্কারের আগে মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীরা	(ঞ) কৃষিকাজ।
(ট) মেসোপোটেমিয়ার প্রধান মন্দিরকে বলা হত	(ট) লাবণ্য ছিল না।
(ঠ) মেসোপোটেমিয়ার মন্দিরগাত্রের চিত্রাবলীতে	(ঠ) জিগুরাট।
(ড) উরের রাজকীয় সমাধি খুঁড়ে	(ড) বংশানুক্রমিক হয়ে যান।
(ঢ) কালক্রমে ধাতু-শিল্পীরা	(ঢ) লাবণ্য ছিল না।
(ণ) মৃৎ-শিল্পের চাকা	(ণ) বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর।
(ত) মেসোপোটেমিয়ার সমৃদ্ধি সাধারণত নির্ভর করত	(ত) প্রথম মেসোপোটেমিয়ায় ব্যবহৃত হত।
(থ) মেসোপোটেমিয়ার প্রথম লেখা অক্ষর	(থ) কনিফর্ম।
(দ) সুমেরীয়দের প্রথম লেখনীকে বলা হত	(দ) সুমের অঞ্চলে সৃষ্টি হয়।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) মেসোপোটেমিয়া কথার অর্থ হলো "স্বর্গের পাহাড়"।

(খ) পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হয় মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে।
(গ) কৃষিকাজের জন্য মেসোপোটেমিয়ান্‌রা প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করত।
(ঘ) মেসোপোটেমিয়ান্‌রা রেশম ও পশম বস্ত্র পরত।
(ঙ) মৃৎ-শিল্পীর চাকা প্রথম মেসোপোটেমিয়ায় ব্যবহৃত হত।
(চ) মেসোপোটেমিয়ান্‌রা বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নত ছিল না।
(ছ) স্থলপথে পরিবহণের জন্য মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীরা চাকার গাড়ী ব্যবহার করত।
(জ) বিশ্বের প্রথমে লেখা অক্ষর মেসোপোটেমিয়ায় আবিষ্কৃত হয়।
(ঝ) সুমেরীয়ান্‌রা পাথরের ওপর লিখত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :
(১) মিশর দেশটি কোথায় অবস্থিত ?
(২) নীল নদের সংকীর্ণ সমতলক্ষেত্রের নাম কি ?
(৩) নীল নদের উভয় তীরের অধিবাসীরা বিভিন্ন কিসে বিভক্ত ছিল ?
(৪) কে প্রথম মিশরে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ?
(৫) মেনেস্ কোথায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ?
(৬) মিশরের রাজাকে কি বলা হত ?
(৭) যে গৃহ থেকে ফ্যারাও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, তাকে কি বলা হত ?
(৮) রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন কে ?
(৯) ফ্যারাওকে শাসন বিষয়ে পরামর্শ দিত কে ?
(১০) ফ্যারাওদের ক্ষমতার মূল ভিত্তি ছিল কি ?
(১১) রাজ্যের প্রধান পুরোহিত ছিলেন কে ?
(১২) মিশরে যুবকদের পড়াশুনা দেখাশোনা করতেন কারা ?
(১৩) মিশরীয়দের লিপিকে কি বলা হয় ?
(১৪) মিশরীয়দের লিপিতে কয়টি অক্ষর ছিল ?
(১৫) কে রসেটা পাথরের লিপির পাঠোদ্ধার করেন ?
(১৬) কৃষকরা যা উৎপাদন করত তার বেশির ভাগ কি হত ?
(১৭) যারা কর দিতে পারত না, তাদের কি করা হত ?
(১৮) শ্রমিকদের রাজার জন্য কি করতে হত ?
(১৯) কারা দাসে পরিণত হয়েছিল ?
(২০) দাসশ্রেণীর অবস্থা কেমন ছিল ?
(২১) কিসের মাধ্যমে প্রাচীন মিশরে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ?
(২২) মিশরে বিদেশী বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে কেন ?
(২৩) মিশরে বিদেশী বাণিজ্য প্রথম দিকে বাধা পায় কেন ?
(২৪) মিশরে বিদেশী বাণিজ্য কার নিয়ন্ত্রণে ছিল ?
(২৫) স্থলপথে পরিবহণের কাজে কোন্ জন্তুর ব্যবহার ছিল ?

(২৬) কোন্ নদীকে মিশরে প্রাচীনকালে জলপথ হিসাবে ব্যবহার করা হত?
(২৭) পিরামিড কাকে বলে?
(২৮) "ফা" কাকে বলে?
(২৯) মিশরের ফ্যারাওরা কি বিশ্বাস করত?
(৩০) মৃতদেহগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মিশরীয়রা কি করত?
(৩১) মমি কাকে বলে?
(৩২) মিশরের সব থেকে প্রসিদ্ধ পিরামিড কোন্‌টি?
(৩৩) মিশরের সব থেকে প্রসিদ্ধ পিরামিডটি কবে নির্মিত হয়?
(৩৪) কোন্ গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে আমরা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারি?
(৩৫) কতজন লোক কতদিন পরিশ্রম করে পিরামিড তৈরি করে?
(৩৬) এক-একটি পিরামিড তৈরি করতে কত খণ্ড পাথরের দরকার হয়েছিল?
(৩৭) কত বর্গফুট এলাকা নিয়ে মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ পিরামিডটি তৈরি হয়েছিল?
(৩৮) মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ পিরামিডটির উচ্চতা কতখানি?
(৩৯) পিরামিডের মধ্যে মমি ও অন্যান্য দ্রব্য থাকত কেন?
(৪০) স্ফিংক্স্ দেখতে কেমন?
(৪১) প্রাচীন মিশরীয়দের প্রধান প্রধান দেবদেবীর নাম কি ছিল?
(৪২) 'রি' ছিলেন কিসের দেবতা ও পরে কিসের দেবতা হন?
(৪৩) 'এ্যামন' প্রথমে ছিলেন কিসের দেবতা ও পরে কিসের দেবতা হন?
(৪৪) 'ওসিরিস্'কে কোন্ দেবতা রূপে কল্পনা করা হত?
(৪৫) কোন্ কোন্ জীবজন্তু প্রাচীন মিশরীয় সমাজে গৃহপালিত হিসেবে ব্যবহৃত হত?
(৪৬) মিশরীয়দের মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি এত জমকালো ছিল কেন?
(৪৭) মিশরের বেশির ভাগ অধিবাসীর মূল জীবিকা কি ছিল?

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলিতে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলিতে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও:

(ক) প্রাচীন মিশরে খাল কেটে জমি চাষ করা হত।
(খ) মিশরীয়রা পশুতে টানা লাঙ্গল ব্যবহার করতে জানত না।
(গ) প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সরকার গঠন করে নিজেদের শাসন করত।
(ঘ) প্রাচীন মিশরে ফ্যারাও বা রাজার ক্ষমতা ছিল সীমিত।
(ঙ) প্রাচীন মিশরে ফ্যারাও বা রাজা ছিলেন ধর্মীয় প্রধান।
(চ) প্রাচীন মিশরে পুরোহিতদের তেমন ক্ষমতা ছিল না।
(ছ) প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল।
(জ) প্রাচীন মিশরীয়রা লেখার পদ্ধতি জানত।
(ঝ) মিশরে শিল্পী ও শ্রমিকদের অবস্থা ভাল ছিল, তারা কখনও বিদ্রোহ করত না।
(ঞ) প্রাচীন মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল আদিম যুগের মত।
(ট) স্থলপথে পরিবহণের জন্য মিশরীয়রা ঘোড়ার ব্যবহার করত।
(ঠ) প্রাচীন মিশরীয়রা আত্মা অবিনশ্বর মনে করত।
(ড) প্রাচীন মিশরীয়রা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) কত খ্রীঃ কে সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করেন ?

(খ) মহেঞ্জোদারো কথার অর্থ কি ?

(গ) সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল কি কি ?

২। বাক্যাংশগুলি সঠিকভাবে সাজাও :

(ক) সিন্ধু-সভ্যতা ছিল	(ক) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও গজদন্ত নির্মিত অলঙ্কার পাওয়া গেছে।
(খ) সিন্ধু-সভ্যতার সাদৃশ্য দেখা যায়	(খ) নগরকেন্দ্রিক।
(গ) মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত বৃহৎ স্নানাগারটি	(গ) মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার।
(ঘ) মহেঞ্জোদারোতে প্রচুর	(ঘ) সিন্ধু হতে পাঞ্জাব এবং রাজস্থান হতে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
(ঙ) সিন্ধু-সভ্যতা ছিল	(ঙ) সম্ভবতঃ জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ।
(চ) সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসের কারণ	(চ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) কোন্ কোন্ নদের উপত্যকায় চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

(খ) চীনের সভ্যতা আনুমানিক কোন্ যুগে গড়ে উঠেছিল ?

(গ) চীনের প্রাচীন সভ্যতা কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছিল বলে অনুমান করা হয় ?

(ঘ) চীনের কোন্ অঞ্চল থেকে মৃৎশিল্পের আবিষ্কার হয় ?

(ঙ) চীনে কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল ?

(চ) চীনের প্রাচীন ইতিহাস কোথা থেকে জানা যায় ?

(ছ) পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে চীনের স্রষ্টা কে ?

(জ) চীনাদের মতে প্রথম মানুষ কে ?

(ঝ) চীনের প্রথম রাজার নাম কি ছিল ?

(ঞ) চীনের দ্বিতীয় রাজার নাম কি ছিল ?

(ট) চীনেরা হলুদ রাজা কাকে বলত ?

(ঠ) কোন্ রাজা চীনাদের অক্ষর শেখান ?

(ড) কোন্ রাজা চীনাদের গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করা শেখান ?

(ঢ) চতুর্থ রাজা ইয়ার্ড চীনাদের কি শেখান ?

(ণ) চীনে প্রথম মানমন্দির কে তৈরি করেন ?

(ত) চীনাদের পঞ্চম রাজার নাম কি ছিল ?

(থ) কে হোয়াং-হো নদীর ওপর বাঁধ বেঁধে চীনাদের বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেন ?
(ধ) 'যু' কত বছর রাজত্ব করেন ?
(ন) চীনের প্রজারা কাকে রাজপদে বসান ?
(প) 'সাং' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

২। বাক্যগুলি সঠিকভাবে সাজাও :

(ক) চীনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল	(ক) আট বছর রাজত্ব করেন।
(খ) অনুমান করা হয় চীনের প্রাচীন শিল্প	(খ) রাজা "শুন"।
(গ) হোনানে আবিষ্কৃত মৃৎ-শিল্পের সঙ্গে	(গ) য়্যাও।
(ঘ) চীনের প্রাচীন ইতিহাস	(ঘ) চীনাদের নক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করতে শেখান।
(ঙ) চীনের পুরাণে আছে	(ঙ) হোয়ংটি।
(চ) চীনাদের প্রথম রাজার নাম ছিল	(চ) হোয়ংটি।
(ছ) চীনাদের দ্বিতীয় রাজার নাম ছিল	(ছ) চীনাদের তৃতীয় রাজা।
(জ) হোয়ংটি ছিলেন	(জ) শেন নুং
(ঝ) চীনাদের অক্ষর শেখান	(ঝ) ফু-সি।
(ঞ) চীনাদের গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি শেখান	(ঞ) পান-কু নামে জনৈক মহাপুরুষ বিশ্বসৃষ্টি করেন।
(ট) চতুর্থ রাজা ইয়াও	(ট) পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে মিশে আছে।
(ঠ) চীনাদের মানমন্দির করেন	(ঠ) সুসা ও এনাউ আবিষ্কৃত মৃৎ-শিল্পের সাদৃশ্য দেখা যায়।
(ড) হোয়াং হো নদীতে বাঁধ দেন	(ড) মেসোপোটেমিয়া ও তার্কিস্তান থেকে এসেছিল।
(ঢ) "যু"	(ঢ) হোয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং নদের উপত্যকায়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। এককথায় উত্তর দাও :
(ক) প্রথম লৌহ তৈরির কৃতিত্ব কাদের ?
(খ) লৌহ যুগের সূত্রপাত হয় কত খ্রীঃ পূঃ ?
(গ) সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কিসের সূত্রপাত হয় ?
(ঘ) লৌহ যুগে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল কারা ?
(ঙ) গ্রীস বা রোমে কারা উৎপাদনের কাজ করত ?

(চ) লৌহযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময়-ব্যবস্থার পরিবর্তে কিসের প্রচলন হয় ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — তামা ও ব্রোঞ্জ থেকে শক্ত, দামেও সস্তা, পাওয়া যায় প্রচুর।
(খ) — আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম যন্ত্রপাতি — তৈরি সম্ভব হয়।
(গ) প্রথম লোহা তৈরির কৃতিত্ব —।
(ঘ) সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গেই সমাজে — সৃষ্টি হয়।
(ঙ) সমাজে যারা — তারা নেমে যায় একদম নীচু শ্রেণীতে।
(চ) শাসক ও অভিজাতরা সাধারণতঃ — ও — বাস করত।
(ছ) সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে — উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাবিলন

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা উত্তর অঞ্চল থেকে সরে এসে কোথায় প্রসার লাভ করে ?
(খ) কোন্ কোন্ সভ্যতার মিলনের ফলে ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়ে ওঠে ?
(গ) নিম্ন মেসোপোটেমিয়ার নতুন রাজধানীর নাম কি ছিল ?
(ঘ) ব্যাবিলনের বিখ্যাত নরপতির নাম কি ছিল ?
(ঙ) প্রাচীন ব্যাবিলনে কি দিয়ে জমি খোঁড়া হত ?
(চ) নদীর বাড়তি জল প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা কি করত ?
(ছ) ব্যাবিলনে সব থেকে বেশী কি উৎপন্ন হত ?
(জ) ব্যাবিলনীয়রা কি ধাতু ঢালাই করতে জানত ?
(ঝ) ব্যাবিলনের সভ্যতা মূলত কোন্ প্রকার সভ্যতা ছিল ?
(ঞ) ব্যাবিলন রাজ্যে রাজার ক্ষমতা কাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল ?
(ট) আইনতঃ ব্যাবিলনের রাজারা কি ছিলেন ?
(ঠ) ব্যাবিলনের রাজাকে প্রকৃত রাজা হতে হলে কাদের স্বীকৃতির প্রয়োজন হত ?
(ড) ব্যাবিলন কি ধরনের রাষ্ট্র ছিল ?
(ঢ) কারা মন্দিরে ধন-সম্পদ দান করত ?
(ণ) ব্যাবিলনের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বড় অংশ কারা নিয়ন্ত্রণ করত ?
(ত) ব্যাবিলনীয়দের অগ্নি-দেবতার নাম কি ?
(থ) সাহমাস৷ ছিলেন কিসের দেবতা ?
(দ) প্রাচীন ব্যাবিলনে চন্দ্রের দেবতা ছিলেন কে ?
(ধ) কালক্রমে কোন্ দেবতা সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন ?
(ন) প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা কিসের ওপর কি দিয়ে লিখত ?

(প) ব্যাবিলনের প্রাচীন কবির নাম কি ?
(ফ) ব্যাবিলনীয়রা একটি বৃত্তকে কয় ভাগে ভাগ করে ?
(ব) ব্যাবিলনীয়রা একটি বৎসরকে কয়টি দিনে ভাগ করে ?
(ভ) ব্যাবিলনীয়রা মাত্র কয়টি সংখ্যার ও কি কি সংখ্যার ব্যবহার জানত ?
(ম) ব্যাবিলনীয়রা একটি দিনকে কয় ঘণ্টায় ভাগ করে ?
(য) সমস্ত আকাশকে ব্যাবিলনীয়রা কয় ভাগে ভাগ করে ?
(র) ব্যাবিলনীয়দের সব থেকে বিস্ময়কর আবিষ্কার কি ?
(ল) হাম্বুরাবি এই আইনসমূহ কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেন ?

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) প্রাচীন ব্যাবিলনে দাস-প্রথার প্রচলন ছিল।
(খ) প্রাচীন ব্যাবিলনের অধিবাসীরা জলসেচ করতে জানত।
(গ) প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা ধাতু ঢালাই করতে জানত।
(ঘ) পরিবহণের কাজে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা ঘোড়া ব্যবহার করত।
(ঙ) প্রাচীনকালে ব্যাবিলন শহর ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল।
(চ) ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন ব্যাবিলনে সরকারী শুল্ক আদায়কারীদের অত্যাচার ছিল না।
(ছ) ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতা মূলত কৃষিকাজের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।
(জ) প্রাচীন ব্যাবিলনে রাজারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।
(ঝ) প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে পুরোহিতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল।
(ঞ) ব্যাবিলন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল।
(ট) মন্দিরের সম্পত্তি পুরোহিতরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারতেন।
(ঠ) প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে পুরোহিতশ্রেণীর উত্থান ও পতন হতে পারত, কিন্তু রাজার পদ ছিল স্থায়ী।
(ড) ব্যাবিলনীয়রা প্রাচীন কাল থেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।
(ঢ) ব্যাবিলনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি খুব উন্নত মানের ছিল।
(ণ) ব্যাবিলনীয়রা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল।
(ত) ব্যাবিলনীয়রা পঞ্জিকার আবিষ্কার করে।
(থ) প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না।
(দ) প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে শ্রেণীভেদ-প্রথা ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে মিশর

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) ঐতিহাসিকরা মিশরের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করেন ?
(খ) পুরোন রাজত্বকে কোন্ যুগ বলা হয় ?

(গ) প্রাচীনকালে মিশরের রাজধানী ছিল কোথায় ?
(ঘ) মিশরের সভ্যতা, শিল্প ইত্যাদির উন্নতি কত খ্রীঃ পূঃ-এর মধ্যে হয়েছিল ?
(ঙ) কোন্ যাযাবর জাতি মিশর দখল করে ?
(চ) কে মিশরকে উপজাতিদের হাত থেকে উদ্ধার করেন ?
(ছ) মিশরের সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(জ) ফ্যারাও তৃতীয় থুটমস্ এশিয়াতে কতবার অভিযান চালান ?
(ঝ) তৃতীয় থুটমস্ নিকট প্রাচ্য অধিকারে রাখবার জন্য কি করেছিলেন ?
(ঞ) মিশরের নতুন রাজধানীর নাম কি ছিল ?
(ট) প্রাচীন মিশরের সব থেকে ক্ষমতাশালী মন্দিরের নাম কি ছিল ?
(ঠ) ফ্যারাও আহমোসের পর কে মিশরের ফ্যারাও হন ?
(ড) ফ্যারাও ইথ্‌নাটন সর্বপ্রথম কোন্ সংস্কারে হাত দেন ?
(ঢ) ফ্যারাও ইথ্‌নাটন কোন্ নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন ?
(ণ) ফ্যারাও ইথ্‌নাটন বহু দেবতার পরিবর্তে কোন্ দেবতার পূজোর প্রচলন করেন ?
(ত) ফ্যারাও ইথ্‌নাটনের পর কে মিশরের ফ্যারাও হন ?
(থ) মিশরের সর্বশেষ ফ্যারাও-এর নাম কি ?
(দ) ইথ্‌নাটন কথার অর্থ কি ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) ঐতিহাসিকরা মিশরের ইতিহাসকে — যুগে বিভক্ত করেন ?
(খ) পুরোন রাজত্বকে বলা হয় — যুগ।
(গ) পুরোন যুগে মিশরের রাজধানী ছিল —।
(ঘ) মিশরের সভ্যতা, শিল্প, ধর্ম, ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয় — খ্রীঃ পূঃ মধ্য রাজত্বের সময়।
(ঙ) — মিশরকে হাইকসাস্‌দের হাত থেকে মুক্ত করেন।
(চ) মিশরের সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —।
(ছ) তৃতীয় থুটমস্ এশিয়াতে — বার অভিযান চালান।
(জ) তৃতীয় থুটমস্ নিকট প্রাচ্য অধিকারে রাখার জন্য একটি সুগঠিত — গঠন করেন।
(ঝ) মিশরের নতুন রাজধানীর নাম ছিল —।
(ঞ) মিশরের সব থেকে বড় ও জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন —।
(ট) তৃতীয় থুটমসের পর ফ্যারাও হন —।
(ঠ) ফ্যারাও ইথ্‌নাটন সমাজে — প্রাধান্য দূর করার চেষ্টা করেন।
(ড) ইথ্‌নাটন কথার অর্থ —।
(ঢ) — ফ্যারাও ইথ্‌নাটন নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন।
(ণ) বহু দেবতার পূজো বন্ধ করে একমাত্র — পূজোর প্রচলন করা হয়।
(ত) ফ্যারাও ইথ্‌নাটনের পর তাঁর জামাতা — সিংহাসনে বসেন।
(থ) মিশরের শেষ এবং বিখ্যাত ফ্যারাও ছিলেন —।
(দ) টুটেনখামন — রাজধানী ফিরিয়ে আনেন।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে √ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) ঐতিহাসিকরা মিশরের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেন।
(খ) পুরোন রাজত্বকে বলা হয় মিশরের ফ্যারাওদের যুগ।
(গ) পুরোন রাজত্বকালে মিশরের রাজধানী ছিল থিব্‌স।
(ঘ) মিশরের সভ্যতা, শিল্প, ধর্ম ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয় পুরোন যুগে।
(ঙ) ফ্যারাও তৃতীয় থুটমস্‌ মিশরকে হাইকসস্‌দের হাত থেকে মুক্ত করেন।
(চ) মিশরের সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফ্যারাও আহমোস্‌।
(ছ) তৃতীয় থুটমস্‌ এশিয়াতে ১৭ বার অভিযান চালান।
(জ) তৃতীয় থুটমস্‌ নিকট প্রাচ্য অধিকারে রাখবার জন্য একটি সুগঠিত নৌ-বাহিনী গঠন করেন।
(ঝ) মিশরের নতুন রাজধানীর নাম ছিল "মেমফিস"।
(ঞ) প্রাচীনকালের মিশর ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল।
(ট) প্রাচীনকালে মিশরে দাস-প্রথার প্রচলন ছিল না।
(ঠ) রাজা বা ফ্যারাও ছিলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী।
(ড) প্রাচীনকালে মিশর একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হলেও পুরোহিতদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল।
(ঢ) ফ্যারাও ইখ্‌নাটন এক দেবতার পরিবর্তে বহু দেবতার পূজোর প্রচলন করেন।
(ণ) ফ্যারাও ইখ্‌নাটন এ্যাখেটাটনে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন।
(ত) ফ্যারাও ইখ্‌নাটন যে ধর্মসংস্কার করেছিলেন, তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।
(থ) ফ্যারাও টুটেনখামন্‌ এ্যামটাটনেই রাজত্ব করতে থাকেন।
(দ) ফ্যারাও টুটেনখামন্‌ বহু দেবতার পরিবর্তে এক দেবতার পূজোর প্রচলন করেন।
(ধ) মিশরের শেষ বিখ্যাত ফ্যারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস্‌।
(ন) প্রাচীন মিশরের পুরোহিতশ্রেণীই মিশরের জন্য দায়ী।
(প) গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ৩২২ খ্রীঃ পূঃ মিশরকে ম্যাসিডনের একটি প্রদেশে পরিণত করেন।

৪। নিম্নলিখিত ফ্যারাওদের নামগুলি রাজত্ব-কালানুসারে সাজাও :
দ্বিতীয় রামেসিস্‌, ফ্যারাও টুটেনখামন্‌, ফ্যারাও ইখ্‌নাটন, ফ্যারাও তৃতীয় থুটমস্‌ ও ফ্যারাও আহমোস্‌।

ইরান

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) পারস্য রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল কোথায়?
(খ) ইরানের দুটি বিখ্যাত প্রাচীন জাতির নাম ছিল কি কি?
(গ) ইরানের দুটি প্রাচীন জাতির মধ্যে শেষ কোন্‌ জাতি বিখ্যাত হয়?
(ঘ) কত খ্রীঃ পূঃ মিডিয়া একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়?

(ঙ) ষষ্ঠ খ্রীঃ পূঃ মেডেসরা কাদের বশ্যতা স্বীকার করে ?
(চ) ইরানীদের প্রাচীন সাম্রাজ্যের নাম কি ছিল ?
(ছ) আকিমিনিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
(জ) ইরানে আকিমিনিদ সাম্রাজ্য প্রায় কত দিন টিকে ছিল ?
(ঝ) কাইরাসের পর আকিমিনিদ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে কে বসেন ?
(ঞ) কোথায় দরায়ুস নতুন রাজধানী স্থাপন করেন ?
(ট) ইরানীদের মূলধর্ম ছিল কি ?
(ঠ) ইরানীদের মুলধর্ম প্রচার করেন কে ?
(ড) ইরানীদের ধর্মপুস্তকের নাম কি ?
(ঢ) ভালর ভগবান কে ?
(ণ) মন্দের ভগবান কে ?
(ত) কাকে কাকে আহুর মাজদার চিহ্ন হিসেবে পূজো করা হত ?
(থ) আহুর মাজদা ছিলেন কিসের প্রতিনিধি ?
(দ) তৃতীয় দরায়ুসকে কে পরাজিত করেন ?

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) প্রাচীন ইরানে এক ঈশ্বরের পূজোর প্রচলন ছিল।
(খ) জরথুস্ট্র বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।
(গ) জরথুস্ট্র বলেছেন পৃথিবী সবল ও দুর্বল—এই দুই শক্তিতে বিভক্ত এবং এরা সর্বদা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত।
(ঘ) প্রাচীন ইরানীয় সমাজে দাস-প্রথার প্রচলন ছিল না।

ইহুদীগণ

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) ইহুদীরা নিজেদেরকে কার বংশধর বলে মনে করত ?
(খ) ইহুদীদের আদি বাসভূমি কোথায় ?
(গ) ইহুদীরা কাদেরকে পরাজিত করে প্যালেস্টাইন দখল করে ?
(ঘ) ইহুদীরা প্যালেস্টাইনকে "প্রতিশ্রুত দেশ" বলত কেন ?
(ঙ) ইহুদীরা তাদের দেশ ত্যাগ করে কোথায় যায় ?
(চ) মিশরের ফ্যারাও ইহুদীদের সংখ্যা কমানোর জন্য কি আদেশ দিয়েছিলেন ?
(ছ) ইহুদীদের মধ্যে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম কি ?
(জ) মোজেস্ কি স্থির করেছিলেন ?
(ঝ) মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা কোন্ সাগর পার হয়ে প্যালেস্টাইনের দিকে রওনা হয় ?
(ঞ) মোজেস্ ইহুদীদের কোন্ পথে প্যালেস্টাইনে নিয়ে যান ?
(ট) কোন্ পর্বতে মোজেস্ ঈশ্বরের কাছ থেকে দশটি আদেশ পান ?

(ঠ) ইহুদীদের প্রথম রাজার নাম কি ?
(ড) সাউলের পর কে রাজা হন ?
(ঢ) ডেভিড কোথায় প্যালেস্টাইনের রাজধানী স্থাপন করেন ?
(ণ) জেরুজালেম কথাটির অর্থ কি ?
(ত) ডেভিডের মৃত্যুর পর কে রাজা হন ?
(থ) ইহুদীদের দেবতার নাম কি ?
(দ) ইহুদী জাতির ইতিহাস কোথায় সংরক্ষিত আছে ?
(ধ) ইহুদী জাতির ভাষা কি ?
(ন) শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের কি হয় ?

২। বাক্যাংশগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(ক) ইহুদীরা বিশ্বাস করত তারা — (ক) পারস্যের সম্রাট ইহুদীদের দেশ জয় করেন।
(খ) ইহুদীদের আদি বাসভূমি ছিল — (খ) হিব্রু ভাষা।
(গ) আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২২০০ সনে — (গ) বাইবেলের "ওল্ড" টেস্টামেন্টের অংশে সংরক্ষিত আছে।
(ঘ) ইহুদীরা কন্নানাইটদের পরাজিত করে — (ঘ) এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী।
(ঙ) ইহুদীরা মনে করত ঈশ্বর — (ঙ) জেহোবা।
(চ) ইহুদীরা তাদের দেশ ত্যাগ করে — (চ) বিরোধী ছিল।
(ছ) মিশরের ফ্যারাও-এর আদেশ ইহুদীদের — (ছ) ধর্মপ্রাণ জাতি।
(জ) ইহুদীদের মধ্যে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তার নাম — (জ) নিকট প্রাচ্যে একটি ব্যস্ত বাজারে পরিণত হয়।
(ঝ) মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা — (ঝ) সলোমন রাজা হন।
(ঞ) মোজেস্ সিনাই পর্বতের পথ ধরে — (ঞ) শান্তির দেশ।
(ট) সিনয় পর্বতে মোজেস্ ঈশ্বরের কাছ থেকে — (ট) নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।
(ঠ) ইহুদীদের প্রথম রাজার নাম — (ঠ) তিনি ছিলেন একজন কবি ও গায়ক
(ড) সলের পর রাজা হন — (ড) ডেভিড রাজা হন।
(ঢ) ডেভিড শুধু রাজাই ছিলেন না — (ঢ) সাউল।
(ণ) ডেভিড জেরুজালেমে — (ণ) দশটি আদেশ পান।
(ত) জেরুজালেম কথাটির অর্থ — (ত) ইহুদীদের নিয়ে চলেন।
(থ) ডেভিডের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র — (থ) লোহিতসাগর পার হয়ে প্যালেস্টাইনের দিকে রওনা হন।
(দ) ডেভিডের রাজত্বকালে জেরুজালেম — (দ) মোজেস্।
(ধ) ইহুদীরা চিরদিনই — (ধ) পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে মেরে ফেলতে হবে।
(ন) ইহুদীরা মূর্তি-পূজোর — (ন) মিশরে যান।

(প) ইহুদীদের দেবতার নাম (প) প্যালেস্টাইনে তাদের বসতি স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন।
(ফ) ইহুদীরা (ফ) প্যালেস্টাইন দখল করেন।
(ব) ইহুদীদের ইতিহাস (ব) ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন।
(ভ) ইহুদীদের ভাষার নাম (ভ) সুমেরু অঞ্চলে উর।
(ম) খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে (ম) অ্যাব্রাহামের বংশধর।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলির পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :
(ক) ইহুদীরা মূর্তি-পূজার পক্ষপাতী ছিল।
(খ) ইহুদীরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করত।
(গ) ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মচিন্তা বাইবেলের "নিউ টেস্টামেন্ট" অংশে সংরক্ষিত আছে।
(ঘ) ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সলোমন।
(ঙ) জেরুজালেম কথাটির অর্থ "পবিত্র দেশ"।
(চ) রাজা সলোমন জেরুজালেমে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

৪। নিম্নলিখিত রাজাদের নাম কালানুসারে সাজাও :
সলোমন, ডেভিড, সাউল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গ্রীস

১। এককথায় উত্তর দাও :
(ক) গ্রীস কোথায় অবস্থিত ?
(খ) গ্রীসের সবটাই প্রায় কোন্ সাগর দিয়ে ঘেরা ?
(গ) কোন্ সাগর গ্রীসকে তুরস্ক থেকে পৃথক করেছে ?
(ঘ) গ্রীসের ভূপ্রকৃতি কি রকম ?
(ঙ) গ্রীসের জীবনে নদী, না সমুদ্র কার প্রভাব সব থেকে বেশী ?
(চ) গ্রীসের ইতিহাসে কোন্ দ্বীপের প্রভাব বিরাট ?
(ছ) গ্রীকরা কোথা থেকে এসেছিল ?
(জ) গ্রীকরা কোন্ ভাষায় কথা বলত ?
(ঝ) কোন্ কোন্ গোষ্ঠীর লোক ঈজিয়ান অঞ্চলে এসেছিল ?
(ঞ) অল্পদিন পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক নিজেদেরকে কি বলত ?
(ট) প্রাচীন গ্রীকরা কয়েকটি কিসে বাস করত ?
(ঠ) কয়েকটি কি নিয়ে এক-একটি গোষ্ঠী হত ?
(ড) কয়েকটি পরিবারের ওপর থাকতেন কে ?
(ঢ) কয়েকটি গোষ্ঠীর ওপর থাকতেন কে ?
(ণ) গ্রীকদের মূল বৃত্তি ছিল কি ?
(ত) প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম কেমন ছিল ?
(থ) 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' মহাকাব্য দুটি কার রচিত ?

(দ) হোমারের সমাজের বিকাশ শুরু হয় কখন থেকে ?
(ধ) প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক সম্পর্ক কি প্রধান ছিল ?
(ন) প্রাচীন গ্রীসের দাস-প্রথার প্রচলন ছিল কি ?
(প) সমাজে প্রধান ভূমিকা পালন করত কারা ?
(ফ) 'নগর-রাষ্ট্র' কাকে বলে ?
(ব) গ্রীসের ইতিহাসে উপনিবেশের যুগ বলে কাকে ?
(ভ) উপনিবেশ কথার অর্থ কি ?

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক, তার পাশে √ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলির পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) গ্রীক সভ্যতায় সমুদ্র অপেক্ষা নদী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।
(খ) ক্রীটনরা গ্রীকদের একটি শাখা।
(গ) ক্রীটনরা ধাতুর ব্যবহার জানত না।
(ঘ) প্রাচীন গ্রীসে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা।
(ঙ) প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম ছিল অত্যন্ত জটিল।
(চ) প্রাচীন গ্রীসে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

স্পার্টা

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে স্পার্টা স্বতন্ত্র ছিল কেন ?
(খ) স্পার্টানদের সম্বন্ধে আমরা কার কাছ থেকে জানতে পারি ?
(গ) স্পার্টানদের মোট জনসংখ্যা কয়ভাগে বিভক্ত ছিল ?
(ঘ) স্পার্টানদের মধ্যে সব থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল কারা ?
(ঙ) বিদেশীরা সমাজে কোন্ শ্রেণীর লোক ছিল ?
(চ) বিদেশীরা বেশির ভাগই কি ছিল ?
(ছ) সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিল কারা ?
(জ) জনপরিষদ কি ?
(ঝ) কারা জনপরিষদের সদস্য হতে পারত ?
(ঞ) গ্রীক সভ্যতায় স্পার্টানদের দান কোন্ ক্ষেত্রে বেশী ছিল —সামরিক ক্ষেত্রে, না সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে — ছিল স্বতন্ত্র।
(খ) স্পার্টানদের মূল বৃত্তি ছিল —।
(গ) স্পার্টানদের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি — কাছ থেকে।
(ঘ) স্পার্টার মোট জনসংখ্যা — ভাগে বিভক্ত ছিল।
(ঙ) একটি — ও — শাসন-ব্যবস্থা দেখাশোনা করত।
(চ) স্পার্টার সরকার ছিল — দ্বারা এবং — জন্য।
(ছ) — বছর বয়স থেকে প্রতিটি যুবক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হত।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলিতে √ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলিতে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) স্পার্টা একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল।
(খ) স্পার্টানদের মূল কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য।
(গ) স্পার্টানদের সমাজে শ্রেণীভেদ-প্রথা ছিল না।
(ঘ) স্পার্টায় দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল না।
(ঙ) দাসদের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।
(চ) স্পার্টানরা নিজেরাই জমি চাষ করত।
(ছ) স্পার্টায় বিদেশীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল।

এথেন্স

১। এককথায় উত্তর দাও :
(ক) এথেন্স শহর কোথায় গড়ে উঠেছিল ?
(খ) এথেন্সে ডেমস্ কাদের বলা হত ?
(গ) সোলন কে ছিলেন ?
(ঘ) বিচারালয়ের বিচারকরা কাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন ?
(ঙ) এথেন্সের গণতন্ত্র কার সময় উন্নতি লাভ করে ?
(চ) গোষ্ঠীতন্ত্রের অবসান ঘটান কে ?
(ছ) অভিজাতদের ক্ষমতা কমাবার জন্য ক্লাইস কি করেন ?
(জ) সৈন্যাধ্যক্ষেরা কাদের কাছে দায়িত্বশীল ছিলেন ?
(ঝ) কাদের সাহায্যে এথেন্সে বিচার করা হত ?
(ঞ) জুরীরা কাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হতেন ?
(ট) এথেনীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকার কাদের ছিল ?
(ঠ) এথেন্সের অধিবাসীদের জঙ্গী ভাব ছিল না কেন ?

২। বাক্যাংশগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(ক) এথেন্স শহর গড়ে উঠেছিল পার্বত্যময়	(খ) অভিজাত পরিবারের হাতে চলে যায়।
(খ) এথেন্সের নগর-রাষ্ট্র স্পার্টা থেকে	(খ) প্রথা উঠিয়ে দিলেন।
(গ) খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে এথেন্সের শাসনভার কয়েকটি	(গ) সোলন মুক্তি দেননি।
(ঘ) সোলন ঋণের জন্য দাসে পরিণত করার	(ঘ) ও প্রতিটি নাগরিক-এর সদস্য ছিলেন।
(ঙ) অন্য দেশ থেকে আনা দাসদের	(ঙ) মধ্য গ্রীসের এ্যাটিকা অঞ্চল।
(চ) সোলন পুরোন জনপরিষদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন	(চ) সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে গড়ে উঠেছিল।
(ছ) সোলন নূতন একটি শাসন-পরিষদ তৈরি করেন	(ছ) মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল এই শাসন-পরিষদের সর্বময় কর্তা
(জ) সোলন বিদেশী যারা এথেন্সে স্থায়িভাবে বাস করত	(জ) পেরিক্লিসের সময়।
(ঝ) এথেন্সের গণতন্ত্রের চরম বিকাশ হয়	(ঝ) নাগরিকত্ব দেন।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক বাক্যগুলিতে ✓ (টিক)-চিহ্ন ও ভুল বাক্যগুলিতে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) এথেন্সে একনায়কতন্ত্র প্রচলিত ছিল।
(খ) এথেন্সে রাষ্ট্র স্পার্টার মতন ভাবে গড়ে উঠেছিল।
(গ) এথেন্সের বিচার-ব্যবস্থায় নাগরিকদের কোন স্থান ছিল না।

এথেন্স ও স্পার্টার লড়াই

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) এথেন্সে গণতন্ত্রের মহিমা শেষ হয়ে যায় কবে?
(খ) প্রথম যুদ্ধ হয় কার সঙ্গে?
(গ) সম্রাট দরায়ুস কে ছিলেন?
(ঘ) দরায়ুসের সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ হয় কোথায়?
(ঙ) ম্যারাথনের যুদ্ধে কারা পরাজিত হয়?
(চ) কত বছর পরে ইরানী সৈন্যবাহিনী পুনরায় এথেন্সে আসে?
(ছ) ইরানীদের সঙ্গে স্পার্টানদের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয় কোথায়?
(জ) এথেন্সে ও স্পার্টার মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, ইতিহাসে তা কোন্ যুদ্ধ নামে খ্যাত?
(ঝ) পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হয়?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রথম যুদ্ধ হয় — সঙ্গে।
(খ) দরায়ুসের সঙ্গে এথেনীয়দের যুদ্ধ হয় —।
(গ) ম্যারাথনের যুদ্ধে — জয়লাভ করে।
(ঘ) — বছর পর ইরানী সৈন্যবাহিনী পুনরায় গ্রীসে আসে।
(ঙ) দ্বিতীয়বার ইরানীদের সঙ্গে স্পার্টান্‌দের যুদ্ধ হয় — নামক স্থানে।
(চ) থার্মোপাইলির যুদ্ধে — পরাজিত হয়।
(ছ) কিছুদিন পর শুরু হয় এথেন্সে ও স্পার্টার মধ্যে — লড়াই।
(জ) এথেন্স ও স্পার্টার লড়াই ইতিহাসে — যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক অবদান

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) গ্রীক সভ্যতায় কার অবদান সবথেকে বেশী?
(খ) কোন্ রাজার সময় এথেন্সের নবজাগরণ শুরু হয়?
(গ) কোন্ রাজার সময় এই নবজাগরণ পরিণতি লাভ করে?
(ঘ) প্রাচীন যুগে এথেন্সের কয়েকজন নাট্যকারের নাম বল।
(ঙ) গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(চ) সবথেকে বড় বিয়োগান্ত নাট্যকারের নাম কি?
(ছ) 'রাজা ওয়াদিপাস', 'এ্যান্তিগোনে', 'ইলেস্ট্রা' নাটকের রচয়িতা কে?

(জ) ইউরিপিডিস তাঁর নাটকে কাদের বর্জন করেছেন ও কাদের আশ্রয় করেছেন ?
(ঝ) গ্রীস নাট্য-সাহিত্যে মিলনান্তক নাটক রচনা করেন কে ?
(ঞ) পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস লেখকের নাম কি ?
(ট) কাকে ইতিহাসের জনক বলা হয় ?
(ঠ) "পেলোপোনেশিয়ান্ যুদ্ধ"—পুস্তক-রচয়িতার নাম কি ?
(ড) থিউসিডাইডিস কে ছিলেন ?
(ঢ) এথেন্সের কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর নাম কর।
(ণ) সক্রেটিস কে ছিলেন ?
(ত) সক্রেটিসের মনীষায় মুগ্ধ হয়ে এথেন্সের তরুণরা কি করেছিল ?
(থ) প্রাচীনপন্থীরা সক্রেটিসের ওপর অসন্তুষ্ট হন কেন ?
(দ) অপরাধী সাব্যস্ত হলে সক্রেটিসের কি হয় ?
(ধ) বিচারে সক্রেটিসের কি দণ্ড হয় ?
(ন) সক্রেটিসের প্রধান শিষ্যের নাম কি ?
(প) প্লেটো কে ছিলেন ?
(ফ) প্লেটো যে শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন, তার নাম কি ?
(ব) প্লেটোর রচিত বইগুলির মধ্যে বিখ্যাত কোন্‌টি ?
(ভ) প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' হইতে কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ?
(ম) এ্যারিস্টটল কে ছিলেন ?
(য) গ্রীসের দুইজন বিখ্যাত স্থপতির নাম লিখ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) বিশ্ববিখ্যাত মনীষী — এথেন্সেই জন্মগ্রহণ করেন।
(খ) — ছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক।
(গ) সক্রেটিস যুক্তি দিয়ে — খণ্ডন করতেন।
(ঘ) — সক্রেটিসের ওপর রেগে যায়।
(ঙ) অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে — সক্রেটিসকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।
(চ) সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য ছিলেন —।
(ছ) প্লেটো ছিলেন —।
(জ) প্লেটো — নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন।
(ঝ) প্লেটোর রচিত বইগুলির মধ্যে — বিখ্যাত।
(ঞ) — ছিলেন প্লেটোর শিষ্য।
(ট) গ্রীক শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায় — সমূহে।
(ঠ) এথেন্সের মন্দিরগুলির মধ্যে — এর মন্দির সবচেয়ে বিখ্যাত।
(ড) — ও ছিলেন গ্রীসের বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী।
(ঢ) — পেরিক্লিস এথেন্সের মন্দির তৈরির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।
(ণ) — ছিলেন গ্রীসের একজন বিখ্যাত ভাস্কর।

ম্যাসিডন

১। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) ম্যাসিডন কখন গ্রীসে প্রাধান্য লাভ করে ?
(খ) ম্যাসিডনের রাজার নাম কি ছিল ?
(গ) ফিলিপের মৃত্যুর পর কে ম্যাসিডনের রাজা হন ?
(ঘ) আলেকজাণ্ডারের মনোবাসনা কি ছিল ?
(ঙ) কত বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসেন ?
(চ) আলেকজাণ্ডার কোন্ দুটি রাজ্য একেবারে ধ্বংস করে ফেলেন ?
(ছ) মিশর দখল করে আলেকজাণ্ডার সেখানে কি করেন ?
(জ) মিশর জয়ের পর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী কোথায় যায় ?
(ঝ) পারস্যের সম্রাটের নাম কি ছিল ?
(ঞ) কোথাকার যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার পারস্যরাজকে পরাজিত করেন ?
(ট) পারস্যজয়ের ফলে আলেকজাণ্ডারের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তারলাভ করে ?
(ঠ) মরু অঞ্চল দখলের পর আলেকজাণ্ডার কোথায় উপস্থিত হন ?
(ড) তক্ষশীলার রাজার নাম কি ছিল ?
(ঢ) পুরু কে ছিলেন ?
(ণ) পুরুকে আলেকজাণ্ডার তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন কেন ?
(ত) ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কতদূর প্রবেশ করেন ?
(থ) আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য কি হয় ?
(দ) গ্রীসের পতন হয় কি করে ?

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে বাক্যগুলি ঠিক, তার পাশে √ (টিক)-চিহ্ন দাও ও যে বাক্যগুলি ভুল, তার পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আলেকজাণ্ডার উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠতে পারেননি।
(খ) আলেকজাণ্ডার মনে মনে সমগ্র বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন।
(গ) পারস্যের সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস আরবেলার যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারকে পরাজিত করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রোম

১। এককথায় উত্তর দাও :

(১) রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল কোথায় ?
(২) ইতালীর প্রথমদিকের অধিবাসীরা কোথা থেকে আসে ?
(৩) ইতালীর অধিবাসীরা কাদের বংশধর ?
(৪) আদি ইতালীয়রা কাদের কাছ থেকে অক্ষর, ধর্মমত ও শিল্প শিক্ষালাভ করে ?
(৫) রোমান সভ্যতা চরম পর্যায়ে পৌছায় কখন ?
(৬) কত খ্রীঃ পূঃ এবং কোথায় রোম শহরের প্রতিষ্ঠা হয় ?
(৭) প্রাচীন রোমের ভাষা কি ছিল ?
(৮) লাটিন ভাষা কোন্ ভাষা থেকে পাওয়া যায় ?

(৯) প্রাচীন রোমে কি ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ?
(১০) রাজা কাদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন ?
(১১) জনপরিষদের সদস্য ছিলেন কারা ?
(১২) সেনেটের সদস্য ছিলেন কারা ?
(১৩) প্রজাতান্ত্রিক রোমে কারা দেশশাসন করতেন ?
(১৪) কন্সালগণ কত বছরের জন্য কাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন ?
(১৫) ফিনিসীয়দের রাজধানী কোথায় ছিল ?
(১৬) কোন্ স্থানকে কেন্দ্র করে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ হয় ?
(১৭) কার্থেজ ও রোমের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তা ইতিহাসে কোন্ যুদ্ধ নামে পরিচিত ?
(১৮) পিউনিকের যুদ্ধে কার্থেজদের নেতৃত্ব দেন কে ?
(১৯) রোমানদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে কার্থেজদের নেতৃত্ব দেন কে ?
(২০) কোথাকার যুদ্ধে হ্যানিবল পরাজিত হন ?
(২১) প্রাচীন রোমের সমাজ কয় ভাগে বিভক্ত ছিল ?
(২২) প্রাচীন রোমের উচ্চশ্রেণীর নাগরিক ইত্যাদিদের কি বলা হত ?
(২৩) প্রাচীন রোমে প্লেবিয়ান কাদের বলা হত ?
(২৪) প্রাচীন রোমের বেশির ভাগ কর কাদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ?
(২৫) প্রাচীন রোমের আইনসমূহ কোথায় লিপিবদ্ধ করা হত ?
(২৬) প্রাচীন রোমে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল কি ?
(২৭) প্রাচীন রোমে 'লেবিলিস' কাদের বলা হত ?
(২৮) 'গ্লেডিয়েটর' কাদের বলা হত ?
(২৯) দাসদের নেতার নাম কি ছিল ?
(৩০) দাস-বিদ্রোহে দাসদের পরাজিত করেন কে ?
(৩১) 'ক্লিয়োপেট্রা' কে ছিলেন ?
(৩২) সীজার কিছুদিন মিশরে থাকেন কেন ?
(৩৩) সীজারের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করেন কে কে ?
(৩৪) অক্টোভিয়ান কি উপাধি গ্রহণ করেন ?
(৩৫) অক্টোভিয়ান কত বৎসর রাজত্ব করেন ?
(৩৬) অক্টোভিয়ান নিজেকে কি বলতেন ?
(৩৭) "প্যাক্স রোমানা" কথার অর্থ কি ?
(৩৮) কার রাজত্বকালে রোমকে 'প্যাক্স রোমানা' বলা হত ?
(৩৯) কনস্টান্টাইন্দের আমলে কোথায় নতুন রাজধানী নির্মাণ করা হয় ?
(৪০) খ্রীষ্টধর্ম কখন রোমান সাম্রাজ্যে আবির্ভূত হয় ?
(৪১) খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(৪২) জোসেফ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
(৪৩) প্যালেস্টাইনের রোমান শাসকের নাম কি ?
(৪৪) জোসেফকে কিভাবে হত্যা করা হয় ?

(৪৫) ক্রুশ খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র কেন ?

(৪৬) 'রেজারেক্‌সন' কাকে বলে ?

(৪৭) খ্রীষ্টানরা 'ইস্টার' পালন করে কেন ?

(৪৮) খ্রীষ্টানরা 'গুডফ্রাইডে' পালন করে কেন ?

(৪৯) জোসেফের জন্মদিনকে খ্রীষ্টানরা কি বলে ?

(৫০) কোন্ রোমান সম্রাট প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ?

২। বাক্যাংশগুলি সঠিকভাবে সাজাওঃ

(ক) রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল	(ক) ২০০ খ্রীঃ পূঃ পর থেকে।
(খ) আল্পস পর্বতমালা ছিল	(খ) ইতালীর উত্তরদিকে।
(গ) ইন্দো-ইউরোপীয়রা ইতালীতে আসতে শুরু করে	(গ) ইতালী।
(ঘ) আদি ইতালীরা গ্রীকদের কাছ থেকে	(ঘ) তারাই নোবিলিস নামে পরিচিত।
(ঙ) প্রাচীন রোমের ভাষা ছিল	(ঙ) তাদের বলা হত নেবিলিস।
(চ) ল্যাটিন ভাষা	(চ) প্লেবিয়ান।
(ছ) প্রাচীন রোমে ছিল	(ছ) সেনেট নামক সভাকে নিয়ন্ত্রিত করত।
(জ) রাজা একটি	(জ) ছিলেন প্যাট্রিশিয়ান।
(ঝ) যুদ্ধে যাবার উপযুক্ত বয়সের সব পুরুষ নাগরিকই ছিলেন	(ঝ) প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান।
(ঞ) ষষ্ঠ খ্রীঃ পূঃ শেষের দিকে রোমে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে	(ঞ) পরাজিত হলেন।
(ট) কন্‌সাল্‌গণ জনপরিষদ কর্তৃক	(ট) রোম এবং কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।
(ঠ) সেনেট	(ঠ) হ্যানিবল।
(ড) পিউনিকের যুদ্ধে কার্থেজের পক্ষে নেতৃত্ব দেন	(ড) হ্যামিলকার বার্কা।
(ঢ) দ্বিতীয় পিউনিকের যুদ্ধে কার্থেজের পক্ষে নেতৃত্ব দেন	(ঢ) অর্থদপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ করত।
(ণ) মিমিলকে কেন্দ্র করেই	(ণ) দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন।
(ত) "হামরা" যুদ্ধে হ্যানিবল	(ত) একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
(থ) রোমাম সমাজ দুইভাগে বিভক্ত ছিল	(থ) জনপরিষদের সদস্য।
(দ) উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক, অভিজাত ও জমিদাররা	(দ) জনপরিষদ ও সেনেটের সাহায্যে শাসন করতেন।
(ধ) প্যাট্রিশিয়ানরাই	(ধ) রাজতন্ত্র।

(ন) শ্রমিক, ছোট ছোট চাষী, কারিগর, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও সৈনিক শ্রেণীর লোকেরা ছিল	(ন) লাটিন।
(প) রোমে যারা রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করত	(প) লাটিয়াম থেকে পাওয়া যায়।
(ফ) অভিজাতদের মধ্যে যারা সমাজের উপর দিকের	(ফ) অক্ষর, ধর্মমত ও শিল্পে শিক্ষালাভ করেছিল।
(ব) সার্কাসে যে সমস্ত দাসরা হিংস্র পশুর সঙ্গে খেলা দেখাত তাদের বলা হত	(ব) হত্যা করা হয়।
(ভ) খ্রীঃ পূঃ ৭৩ সনে স্পার্টাকাস্ নামে একজন দাস	(ভ) জোসেফ।
(ম) স্পার্টাকাস্ কেপুয়ার ইস্কুলের সহকর্মীদের বোঝান যে পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে	(ম) প্যাক্স রোমানা।
(য) স্পার্টাকাস্ দক্ষিণ ইটালিতে	(য) সিনেটের মধ্যেই নিহত হলেন।
(র) ক্লিয়োপেট্রা ছিলেন	(র) চরম আকার ধারণ করে।
(ল) পম্পে ও জুলিয়াস্ সীজারের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব	(ল) মিশরের রানী।
(ব) ব্রুটাসের ষড়যন্ত্রে সীজার	(ব) এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
(শ) অগস্টাসের রাজত্বকালকে বলে	(শ) স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।
(ষ) খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন	(ষ) অন্যান্য দাসদের একত্রিত করে।
(স) জোসেফকে ক্রুশবিদ্ধ করে।	(স) গ্লেডিয়েটর।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি সঠিক, তার পাশে ✓ (টিক)-চিহ্ন দাও এবং যে বাক্যগুলি ভুল, তার পাশে × (ক্রশ)-চিহ্ন দাও :

(ক) প্রাচীন রোমে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল।
(খ) রোমের দাসরা কখনও বিদ্রোহ করত না।
(গ) প্রাচীম রোমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না।
(ঘ) ট্রিবিউনের সদস্যদের নির্বাচিত করবার অধিকার প্লেবিয়ানদের দেওয়া হয়নি।
(ঙ) জনপরিষদ যে কোন প্রস্তাব নাকচ করতে পারত।
(চ) কন্‌সালগণ বিচারকের কাজ করতে পারতেন না।
(ছ) রোমান রাজারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য শাসন করতেন।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) চীনের — সভ্যতা যার সঙ্গে — আমাদের পরিচিত করেন তা হল — সভ্যতা।

(২) সাং-সভ্যতার মানুষ যে — সভ্যতার সৃষ্টি করে তা অন্য যে কোনও — সমান ছিল।
(৩) এই সময় সাং-সভ্যতার মানুষ — ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করেন ও — আয়ত্ত করেন।
(৪) চীনের সভ্যতার — যুগে সমাজে রাজার পরে ছিলেন —।
(৫) সাং মানুষের প্রাচুর্য নির্ভর করত —।
(৬) — ছিল প্রধান শস্য।
(৭) চীনের অধিবাসীরা — শিল্পে পারদর্শী ছিল।
(৮) সাং বংশের শেষ রাজা — বংশের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন।
(৯) চৌ রাজত্ব চীনের ইতিহাসে —।
(১০) মহাপ্রাণ —, —, —, এই সময়ের লোক।
(১১) কনফুসিয়াসের আসল নাম —।
(১২) দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকে তিনি — ও — শিক্ষা করেন।
(১৩) দেশময় —, —, —, —; লোকের জীবন — হয়ে উঠলো।
(১৪) চীনের মানুষের দুঃখবেদনা কনফুসিয়াস্‌কে — করলো।
(১৫) তাঁর চিন্তার ফসলই হল তাঁর বিখ্যাত —।
(১৬) বাইশ বছর বয়সে কনফুসিয়াস্ নিজের বাড়ীতে — খোলেন।
(১৭) বিদ্যালয়ে — ও — শিক্ষা দেওয়া হত।
(১৮) তিনি — মত মুখের — মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন।
(১৯) কনফুসিয়াস্ — শহরের — পদে নিযুক্ত হন।
(২০) রাজার — অবনতি হলে তিনি — পদত্যাগ করেন।
(২১) তিনি — বছর চীনদেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে তাঁর — প্রচার করলনে।
(২২) কনফুসিয়াসের — বছর বয়সে — প্রদেশের শাসক তাঁকে দেশে নিয়ে এলেন।
(২৩) কনফুসিয়াস্ তাঁর উপদেশাবলী — লিপিবদ্ধ করে যান যা চীনে — নামে পরিচিত।
(২৪) এই বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন —।
(২৫) তিনি নিজেকে — উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
(২৬) তাঁর সময়ে চীন সাম্রাজ্য — ও — পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।
(২৭) তাঁর আমলে বড় বড় — ও বহু — খাল তৈরি হয়।
(২৮) তাঁর আমলে অনেক — ও — সংস্কার হয়।
(২৯) তাঁর আমলে — আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিখ্যাত — তৈরি হয়।
(৩০) তিনি — উপদেশাবলী পছন্দ করতেন না।
(৩১) চিন বংশকে উচ্ছেদ করে — বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈদিক যুগ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) সিন্ধু-সভ্যতার পর — সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

(২) আর্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম — ।
(৩) বেদের অপর নাম — ।
(৪) বেদ চারটি ভাগে বিভক্ত —, —, —, — ।
(৫) ঋকৃবেদ সর্বাধিক — ।
(৬) সর্বশেষে রচিত হয় — ।
(৭) — দার্শনিক তত্ব আলোচনা করা হয়েছে।
(৮) রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী দীর্ঘদিন লোকমুখে — হিসেবে প্রচলিত ছিল।
(৯) — ছিল আর্য-সভ্যতার মূল ভিত্তি।
(১০) বৈদিক আর্যদের মধ্যে — পূজোর প্রচলন ছিল না।
(১১) বিভিন্ন প্রকার — শক্তি দেবদেবী কল্পনা করে তারা — করত।
(১২) বৈদিক সমাজ ছিল — ।
(১৩) গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি — বলে পরিচিত ছিলেন।
(১৪) কয়েকটি গ্রাম দিয়ে গঠিত হত — বা — ।
(১৫) রাজার কাজে — ও — প্রধান সহায়ক ছিলেন।
(১৬) রাজাকে — ও — নামে দুটি পরিষদের পরামর্শ নিতে হত।

২। যে উত্তরটি শুদ্ধ, সেটির নীচে দাগ দাও :
(১) আর্যদের আদি নিবাস ছিল — মধ্য এশিয়া/ভারতবর্ষ।
(২) আর্যদের সমাজের মূল ভিত্তি ছিল—সমাজধর্ম।
(৩) যাঁরা শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করতেন, তাঁদের ব্রাহ্মণ/বৈশ্য বলা হত।
(৪) আর্য-সভ্যতা ছিল — নগর-কেন্দ্রিক/গ্রাম-ভিত্তিক।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(১) — জৈন ধর্ম প্রবর্তন করেন।
(২) মহাবীরের পিতা ও মাতার নাম ছিল — এবং — ।
(৩) মহাবীরের মাতার নাম ছিল — ।
(৪) মহাবীর — নামে এক কুমারীকে বিয়ে করেন।
(৫) — নামে গুরুর কাছে মহাবীর দীক্ষা নেন।
(৬) — লাভ করার পর তিনি — ও — নামে পরিচিত হন।
(৭) — নামক স্থানে মহাবীর দেহত্যাগ করেন।
(৮) জৈন ধর্ম — অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।
(৯) মহাবীর প্রচারিত ধর্মমত — নামে পরিচিত।
(১০) মহাবীরের উপদেশাবলী বারোটি — সঙ্কলিত হয়।
(১১) পরবর্তী কালে জৈনেরা — ও — নামে দু'ভাগে বিভক্ত হয়।
(১২) "— — —" জৈনধর্মের মূল নীতি।
(১৩) বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন — ।
(১৪) বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম ছিল — ।
(১৫) বুদ্ধদেবের জন্ম হয় আনুমানিক — খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

(১৬) বুদ্ধদেবের পিতা ও মাতার নাম ছিল — এবং —।
(১৭) বুদ্ধদেবের সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে সংসারত্যাগকে — বলে।
(১৮) দিব্যজ্ঞান লাভের পর সিদ্ধার্থের নাম হয় —।
(১৯) যে স্থানে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তার নাম হয় —।
(২০) যে অশ্বত্থ গাছের মূলে বসে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তার নাম হয় —।
(২১) বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ঘটনা ইতিহাসে — নামে খ্যাত।
(২২) মুক্তিলাভের জন্য আটটি পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইহা — নামে পরিচিত।
(২৩) বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী — নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :

(১) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন—মহাবীর/সিদ্ধার্থ।
(২) বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী কখন লিপিবদ্ধ হয়েছিল —তাঁর মৃত্যুর পরে/তাঁর মৃত্যুর পূর্বে।
(৩) বুদ্ধদেব ছিলেন—লিচ্ছবি বংশজাত/শাক্য বংশজাত।
(৪) মহাবীরের পিতার নাম ছিল—গৌতম/সিদ্ধার্থ।
(৫) সিদ্ধার্থ বিয়ে করেন — যশোদাকে/গোপাকে।
(৬) মহাবীর গোঁসাল/রুদ্রকের কাছে দীক্ষা নেন।
(৭) বুদ্ধদেব তাঁর উপদেশাবলীতে জোর দিয়েছিলেন ত্রিরত্নের ওপর/অষ্টাঙ্গিক মার্গের ওপর।
(৮) সংসারজীবনে মহাবীরের নাম ছিল বর্ধমান/গৌতম।
(৯) মহাবীর প্রচারিত ধর্মের নাম নির্গ্রন্থ/বৌদ্ধ।

সাম্রাজ্যসমূহ

১। এককথায় উত্তর দাও :

(১) ষোড়শ মহাজনপদ কি?
(২) বিম্বিসার কোন্ বংশের রাজা ছিলেন?
(৩) বিম্বিসারের পুত্রের নাম কি?
(৪) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(৫) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে মগধের রাজা কে ছিলেন?
(৬) নন্দবংশ ধ্বংস করেন কে?
(৭) নন্দবংশ উচ্ছেদসাধনে চন্দ্রগুপ্তকে কে সাহায্য করেছিলেন?
(৮) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে কোন্ গ্রীকদূত এদেশে এসেছিলেন?
(৯) কোন্ গ্রীক শাসক চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন?
(১০) কোন্ যুদ্ধে অশোকের পরিবর্তন হয়েছিল?
(১১) মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?
(১২) কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর অশোক কি সিদ্ধান্ত নেন?
(১৩) ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক কোন্ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন?
(১৪) সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক কাদের পাঠান?
(১৫) কুষাণরা কারা?

(১৬) কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ?
(১৭) কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(১৮) কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ?
(১৯) গান্ধার-শিল্প কি ?
(২০) কত খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দ প্রচলিত হয় ?
(২১) চরক কে ছিলেন ?
(২২) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(২৩) গুপ্ত বংশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা কে ?
(২৪) গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ?
(২৫) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ?
(২৬) কার রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করেছিল ?
(২৭) এলাহাবাদ-প্রশস্তি কার রচনা ?
(২৮) গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন ?

২। বাক্যাংশগুলি সঠিক ভাবে সাজাও :

(১) নন্দবংশের শেষ রাজা	(১) হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।
(২) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	(২) তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করেন।
(৩) বিন্দুসার	(৩) ছিলেন ধননন্দ।
(৪) অশোক	(৪) গ্রীকবীর সেলুকাসকে পরাজিত করেন।
(৫) কৌটিল্য	(৫) মৌর্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।
(৬) চরক	(৬) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সাহায্য করেন।
(৭) সমুদ্রগুপ্তকে	(৭) কবিরাজ বলা হত।
(৮) প্রাচীন বাংলার ইতিহাস	(৮) লোকেরা প্রায় একই শ্রেণীর ছিল।
(৯) বৌধায়ন ও ধর্ম সূত্রে	(৯) পুরাণ কথায় আচ্ছন্ন।
(১০) বিরোধ ও স্বীকৃতির কাজ	(১০) শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছিল।
(১১) মহাভারতে সভা-পর্বে	(১১) বঙ্গ ও পুণ্ড্র জনপদগুলিকে আর্য-সভ্যতার বাইরে বলা হয়েছে।
(১২) অঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কোমের	(১২) সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হতে মৌর্য আমলের আগে হয়নি।
(১৩) প্রাচীন বাংলার রাজতন্ত্র	(১৩) বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হয়।
(১৪) কুষাণ আমলের	(১৪) চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন।
(১৫) সমুদ্রগুপ্ত	(১৫) কিছু স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু মুদ্রা বাংলাদেশে পাওয়া গেছে।

১। এককথায় উত্তর লেখ :

(১) ভারতের সব থেকে প্রাচীন ভাষা কি ?
(২) বেদ, ব্রাহ্মণসমূহ ও উপনিষদগুলি কোন্ ভাষায় রচিত হয়েছিল ?
(৩) কালক্রমে সংস্কৃতের সঙ্গে অন্য কি ভাষার সৃষ্টি হ'ল ?
(৪) কি কারণে প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তন হল ?

(৫) মৌর্যযুগে শাসনের জন্য কোন্ ভাষা ব্যবহার করা হত ?
(৬) অশোক তাঁর শিলালিপিতে কোন্ কোন্ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন ?
(৭) কোন্ লিপি থেকে ভারতের বেশির ভাগ লিপি তৈরি হয়েছে ?
(৮) কখন রামায়ণ-মহাভারত লিখিত হয় ?
(৯) কার চেষ্টায় সংস্কৃত শিক্ষা ভাষায় পরিণত হয় ?
(১০) বেশির ভাগ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মপুস্তক কোন্ ভাষায় রচিত ?
(১১) গুপ্তযুগে কোন্ ভাষায় সাহিত্য রচনা হত ?
(১২) কালিদাস কখন জন্মগ্রহণ করেন ?
(১৩) কালিদাসের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কি ?
(১৪) 'মুদ্রারাক্ষস' কার রচনা ?
(১৫) "মৃচ্ছকটিক" কে রচনা করেন ?
(১৬) "দশকুমারচরিত" কার রচনা ?
(১৭) হরপ্পার ধ্বংসের পর প্রায় কত বছর শিল্পের উন্নতি হয় ?

২। সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :

(১) আর্যরা ব্যবহার করত—সংস্কৃত ভাষা/খরোষ্ঠী ভাষা/পালি ভাষা।
(২) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছিল —প্রাকৃত ভাষায়/সুরসেনী ভাষায়/পালি ভাষায়।
(৩) রামায়ণ ও মহাভারত লিখিত হয়—মৌর্য আমলে/কুষাণ আমলে/গুপ্ত আমলে।
(৪) প্রথম সংস্কৃত আমলে ব্যাকরণ সৃষ্টি করেন—চরক/কালিদাস/ সুশ্রুত/পাণিনি।
(৫) সাহিত্যে স্বর্ণযুগ—মৌর্যযুগ/গুপ্তযুগ/কুষাণযুগ।
(৬) অজন্তার গুহাচিত্রগুলি—মৌর্যযুগে অঙ্কিত/গুপ্তযুগে অঙ্কিত।
(৭) আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন—নাট্যকার/শিল্পী/বিজ্ঞানী।
(৮) "কুমারসম্ভব" নাটকটি—বিশাখদত্ত/কালিদাস/শূদ্রক রচিত।
(৯) "স্বর্ণযুগ" বলা হয়—মৌর্যযুগ/কুষাণযুগ/গুপ্তযুগকে।
(১০) ভারতের বেশির ভাগ লিপি তৈরি হয়েছে—পালি লিপি/খরোষ্ঠী লিপি/ব্রাহ্মী লিপি থেকে।
(১১) জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে—মূর্তি তৈরি থেকে/জলাশয় নির্মাণ থেকে/দেবতার উঁচু আসন নির্মাণ থেকে।
(১২) নালন্দা একটি বিখ্যাত—মন্দির/গুহা/বিশ্ববিদ্যালয়।